এ যুগের জননায়ক

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু

বুক ইণ্ডাষ্ট্রীজ
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৭১

মূল্য এক টাকা

বাঁধাই মূল্য ৸৹ আনা

শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক ১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত
ও ১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, সবিতা প্রেসে, শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
জেনারেল চিয়াং কাই-শেক	...	...	১
ডি-ভ্যালেরা	...	...	১৫
লেলিন	..	...	৩০
কেমাল আতাতুর্ক	...	...	৫২
মুসোলিনী	...	...	৭১
হিট্‌লার	...	...	১০৪
মহাত্মা গান্ধী	...	...	১২১

এ যুগের জননায়ক

জেনারেল চিয়াং কাই-শেক্

১৯১১ সালের কথা। সারা পৃথিবীতে সাড়া প'ড়ে গেছে। চীনের বিদ্রোহী-দল মাঞ্চু-বংশের পতন ঘটিয়েছে, মাঞ্চুরাজ চীনের সিংহাসন থেকে অপসৃত হয়েছেন এবং সুবিস্তীর্ণ চীন-সাম্রাজ্য বিদ্রোহী রিপাব্লিকান বা প্রজাতন্ত্রবাদীদের শাসনাধীনে এসেছে। এ সংবাদে জাপানীরা ভীত হ'ল সকলের বেশি। জাপানে শাসন-কর্ত্তারা ত্রস্ত হয়ে উঠলেন এবং প্রজাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। জাপান-প্রবাসী চীনা ছাত্রদের উপর জাপ সরকার কড়া নজর রাখতে লাগলেন। কেননা, এই তরুণ ছাত্রদের অসাধ্য কিছুই নেই, প্রজাতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই ছাত্র-যুবকরা সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা এবং শান্তি রক্ষার প্রধান অন্তরায়, রাজতন্ত্রের তারা শত্রু।

এহেন সময়ে জাপানের প্রসিদ্ধ সরকারী সমর-শিক্ষাকেন্দ্রে রব উঠলো যে একটি চীনা ছাত্র-সেনানী সকলের অজ্ঞাতে জাপান পরিত্যাগ করেছে, কোথাও তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারী সমর-শিক্ষার কলেজ থেকে কোন ছাত্র যদি পলায়ন করে তাতে সরকারের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। তার উপর এই বিদ্রোহের দিনে চীনা ছাত্রের রহস্যময় অন্তর্দ্ধানে কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু রহস্য অচিরেই উদ্ঘাটিত হ'ল। চীন-প্রত্যাগত এক জাহাজে ঐ কলেজের অধ্যক্ষের নামে একটা প্যাকেট এসে হাজির।

প্যাকেটটা খুলে দেখা গেল একটি তরবারি এবং ঐ কলেজেরই ছাত্রদের একটি পরিচ্ছদ। পলাতক চীনা ছাত্রটি তার তরবারি আর পরিচ্ছদ প্রত্যর্পণ ক'রে জাপান সরকারের সঙ্গে তার চির-বিচ্ছেদ ঘোষণা করেছে!

এই দুঃসাহসী চীনা ছাত্রটির নাম চিয়াং কাই-শেক্। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যজাতি এবং সমগ্র ইয়োরোপের সমানায়তন এক বিপুল দেশের ইনি এখন সর্ব্বজন-মান্য ভাগ্যবিধাতা। বর্ত্তমান চীন-সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্রের সর্ব্ববিভাগের শীর্ষে চিয়াং কাই-শেকের আসন, চীনের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কুয়োমিনটাংএর ইনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। তাঁর সুকঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার কাছে সব-কিছু তুচ্ছ, অথচ যারা তাঁর শত্রুতা করেছে তাদের মধ্যে অনেককে তিনি বিনা দ্বিধায় ক্ষমা করেছেন, তাদের কাজ দিয়েছেন। জাপানের সঙ্গে আমরণ সংগ্রাম ক'রে চীনের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা তাঁর জীবনেব একমাত্র কামনা, অথচ বিক্ষিপ্ত চীনকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে ইনি জাপানকে অবাধে এগিয়ে আস্‌তে দিয়েছেন। চীনের জাতীয় শক্তিকে সংহত করতে গিয়ে চিয়াং যখন জাপানের অগ্রগতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তখন পৃথিবীর লোকে তাঁকে চীনদেশেরই মত দুর্ব্বোধ্য ভেবেছে! কিন্তু চিয়াং বীর, তিনি শত্রুকে কোন অবস্থায়ই ভয় করেননি, চীনকে তিনি প্রকৃত মর্য্যাদা দান ক'রে পৃথিবীকে চমৎকৃত করেছেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেঙ্গুয়া জেলার চিকো গ্রামে চিয়াং জন্মগ্রহণ করেন। 'চিয়াং' এঁদের বংশের নাম। বাল্যকালে এঁর নাম ছিল 'জুই তাই'। পরে চৈনিক প্রথা অনুযায়ী চিয়াং নিজের নাম রাখেন 'কাই শেক্'। 'কাই শেক্' শব্দের অর্থ 'সীমান্তের প্রস্তর'। বাস্তবিকই চিয়াং তাঁর প্রভূত শক্তিসাহস নিয়ে চীনের সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছেন,

কোন শত্রুর সাহস নেই তাঁকে পরাভূত ক'রে চীনের অমর্য্যাদা করে।

ফেঙ্গুয়া জেলার অধিবাসীরা কেউ জেলে, কেউ ছোটখাটো সওদাগর, কেউবা ঐ রকম আর-কিছু। সমুদ্রতীরবর্ত্তী ব'লে এই জেলার অধিবাসীরা বংশ-পরম্পরায় বৈদেশিক সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হযে এসেছে। কেউ কেউ বলেন চিয়াং-এর পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে পর্ত্তুগীজ এবং আরব বণিকরা অবাধে মিশে গিয়েছিল। সে যাই হোক্ চিযাং খুব বড়লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ না করলেও তাঁর পিতা খুব দরিদ্র ছিলেন না। অতি শৈশবেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং চিযাংএর মাতা একাধারে তাঁর পিতার এবং মাতার কর্ত্তব্য পালন ক'রে তাঁকে মানুষ করতে লাগলেন।

হিট্‌লার এবং কামাল আতাতুর্কের মায়ের মত চিয়াংএর মাতাও অসাধারণ রমণী ছিলেন। চিয়াংকে মানুষ ক'রে তুলবেন এই আশায় বুক বেঁধে সেই স্বামিহীনা মেয়েটি সংসার করতে লাগলেন। তিনি চিয়াংকে স্কুলে দিলেন। কিন্তু স্কুলে চিয়াং খুব মেধার পরিচয় দিতে পারলেন না, পরীক্ষায় পাশ ক'রে গেলেন বটে কিন্তু তাঁর বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাওযা গেল না। মাত্র পনেরো বছর বয়সে চিয়াংএর বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু বালক চিয়াং তখন দিনরাত্রি আধুনিক হবার স্বপ্ন দেখেন এবং চীনদেশের কুসংস্কার পরিত্যাগ ক'রে ইয়োরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন। তাঁর মা যখন তাঁকে নিয়ে নতুন ক'রে সংসার পাতবার চেষ্টা করছেন তখন একদিন অকস্মাৎ চিয়াং জাপান যাত্রা করলেন। মাকে ব'লে গেলেন তিনি টোকিও থেকে আধুনিক সমর-বিজ্ঞান শিক্ষা ক'রে রীতিমত উচ্চশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী হয়ে ফিরে আসবেন।

মা বাধা দিলেন না, নীরবে চোখের জলে তাঁর চিয়াংকে বিদায় দিলেন।

সেদিনকার অসংখ্য চীনা ছাত্রদের মত চিয়াং জাপান যাত্রা করলেন জাপানকে সেই দেশ কল্পনা ক'রে যে-দেশ ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে ইয়োরোপীয় জাতিগুলির হাত থেকে এশিয়াকে বাঁচাবার জন্যে মৃত্যুপণ করেছে।

চিয়াং যখন জাপানে গেলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বৎসর। এত আশা ক'রে সেখানে গিয়ে তাঁকে হতাশ হতে হ'ল—জাপান গবর্ণমেন্ট জানালেন যে চীনের মাঞ্চু গবর্ণমেণ্টের কোন পরিচয়-পত্র এবং অনুমোদন-পত্র না পেলে তাঁকে জাপানের কোন সামরিক স্কুলে ভর্ত্তি করা হবে না। চিয়াং চীনে ফিরে এসেই পিকিংএর মিলিটারি স্কুলে ভর্ত্তি হ'লেন। এখানে কিছুদিন সমর-বিদ্যা শিক্ষা ক'রে তিনি পুনরায় জাপান যাত্রা করলেন এবং সেখানকার সরকারী সামরিক কলেজে ভর্ত্তি হ'লেন। জাপানেই তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় সেইদিন থেকে যেদিন চীনের শ্রেষ্ঠ বীর, ডক্টর সান্ ইয়াৎ সেন্-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'ল। জাপানে ব'সেই চিযাং জাপানেব কবল থেকে চীনকে মুক্ত করার ব্রত গ্রহণ করেন।

জাপানে চিয়াং কয়েক বৎসর জাপানী সমরবিভাগে চাক্বি করেন। সান্ ইয়াৎ সেনের সঙ্গে যখন তাঁর পবিচয হয তখন তাঁর বয়স বাইশ বৎসর। এর পরও দু'বছর জাপানে তি নি চাক্বি করেন, কিন্তু নির্ব্বাসিত বিপ্লবী নেতা সান্ ইয়াৎ সেন তাঁকে জাতীয়তার যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন সেই মন্ত্রই তাঁব অন্তরকে অহরহ চীনের দিকে আকর্ষণ করতো। এমন সময়ে মাঞ্চু-বংশের পতনের সংবাদ গিয়ে পৌঁছল এবং চিয়াং চীনের বিবদমান বিদ্রোহী দলগুলির মাঝে

অবতীর্ণ হলেন। চিয়াংএর এই চীন-প্রত্যাবর্ত্তনের অভিনব কাহিনী পূর্ব্বেই বলেছি।

চিয়াং চীনে এসেই সান্ ইয়াৎ সেনের দলে যোগ দিলেন। এই দলটিই তখন চীনের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী দল। চিয়াং নিজে একটি সৈন্যদলের নেতা হ'লেন। চীনে যদিও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তবুও রাজবিদ্রোহীদের মধ্যে বহু দল ছিল। উত্তর চীন এবং দক্ষিণ চীনের বহু উপদল কর্ত্তৃত্বের লোভে সান্ ইয়াৎ সেনের বিরোধিতা করে। অনেকে আদর্শগত বিরোধের জন্য বিপক্ষদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই দলাদলি রীতিমত বহু খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হয়। এই আত্মকলহে চীনের যে লোকক্ষয় হয় চীনের ইতিহাসে সে রকম লোকক্ষয় আর হয়নি। একটি বিদ্রোহীদল আর একটি বিদ্রোহীদলেব উচ্ছেদ সাধন করবার জন্যে সশস্ত্র আক্রমণ চালাতো। এমন কি সান্ ইয়াৎ সেনের একবার আততায়ীর হাতে জীবনসংশয় ঘটেছিল। এইসময় চিয়াং সদলবলে তাঁকে রক্ষা করেন।

সান্ ইয়াৎ সেনেব জীবনরক্ষা করার পর থেকে চিয়াংএর নাম চারিদিকে ছড়িযে পড়ে; দৃঢ়চিত্ত এবং বলদৃপ্ত বিদ্রোহী সৈনিক ব'লে চিয়াং এই প্রথম খ্যাতি অর্জ্জন করলেন। চিয়াং সান্ ইয়াৎ সেনেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহকর্ম্মী ব'লে পরিগণিত হ'লেন। কিন্তু চিয়াং হঠাৎ সৈন্যদল থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। তিনি সৈন্যদল পরিত্যাগ ক'রে এক দালালের অফিসে কেরাণীর কাজ নিলেন।

অতঃপব সকলে সবিস্ময়ে দেখলে যে চিয়াং ব্যবসায়ে মন দিয়েছেন। তিনি নানাবিধ ব্যবসাযে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁর চরিত্রের গুণে এবং আচরণের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে দু'জন প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি স্বীয় পুত্রের মত তাঁকে তাঁর আদর্শে উপনীত হবার জন্যে সাহায্য

করতে স্বীকার করেন। এঁদের মধ্যে একজনের নাম চেন্ চিমি ; ইনি চিয়াংকে এক গোপনচারী জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করতে সাহায্য করেন এবং এঁরই সাহায্যে চিয়াং এক বিরাট শক্তিশালী দল গ'ড়ে তুলতে সক্ষম হন। আর একজনের নাম চ্যাং চিন্-কিয়াং, ইনি চিয়াংকে তাঁর ব্যবসায়ে সাহায্য করেন এবং এঁরই কৃপায় চিয়াং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। এই দুই মহানুভব চৈনিক জাতীয়তাবাদী ধনিকের স্নেহ লাভ চিয়াংএর জীবনে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত।

চিয়াং যেদিন ব্যবসায়ের দিকে মন দেন সেদিন লোকে তাঁকে নিন্দা করেছিল কিন্তু চিয়াং জানতেন যে চীনের মত বিরাট দেশে সত্যিকারের স্বাধীনতা এবং শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন এবং সে অর্থ উপার্জ্জন করা বা সংগ্রহ করার দায়িত্ব তাঁরই।

পাঁচ বছর পরে ১৯২১ সালে চিয়াং তাঁর আপন পথে ফিরে এলেন। সমগ্র চীন তখন এক চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে চলেছে। চীনজাতিকে সেদিন স্পষ্ট ঘোষণা করতে হবে যে বিদেশীদের অভিভাবকত্বে আর তার প্রয়োজন নেই, চীনের জনগণই জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। সান্ ইয়াৎ সেন ঘোষণা করলেন যে সমগ্র চীনজাতির রাজনৈতিক আদর্শ হবে মাত্র তিনটি উদ্দেশ্য সফল ক'রে তোলা ; প্রথমটি জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা, দ্বিতীয়টি গণতন্ত্রের প্রসার এবং তৃতীয়টি জনগণের জীবিকা-অর্জ্জনের পথ-নির্দ্দেশ। সান্ ইয়াৎ সেন তাঁর ঘোষণায় একথা স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিলেন যে, চীনদেশে বৈদেশিকরা যে সমস্ত অধিকার এবং প্রজাস্বত্ব পেয়ে এসেছে সে সমস্তই ন্যায়বিগর্হিত ব'লে বিবেচিত হবে, চীনের বিভিন্ন সম্প্রদায়

এবং দলকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে বাধ্য করা হবে এবং চীনের জনগণকে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন সুশিক্ষিত ক'রে তুল্তে হবে।

এই ঘোষণাতে চীনজাতির সমর্থন ছিল এবং সেইজন্য প্রায় সমগ্র ইয়োরোপ চীনের এই প্রজাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধনে তৎপর হ'ল। সান্ ইয়াৎ সেন রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। গণতন্ত্রের পুরোহিত লেনিন তাঁকে হতাশ করবেন না এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। কিন্তু কে যাবে এই দুঃসাহসিক ঐতিহাসিক বার্ত্তার দূত হয়ে? সান্ ইয়াৎ সেন দেখলেন চিয়াং পুনরায় তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি চিয়াংকেই চীনের প্রজাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রনৈতিক দূতরূপে রাশিয়ায় প্রেরণ করলেন। মস্কো যাত্রার পূর্ব্বে চিয়াং প্রায় দু'মাস এক যুদ্ধজাহাজে সান্ ইয়াৎ সেন্-এর সঙ্গে একত্রে বাস করেন। এই দীর্ঘকাল সমুদ্রবক্ষে এই দুই অসমসাহসী দেশপ্রেমিক যোদ্ধার মধ্যে যে ভাববিনিময় হয়েছিল তারই মধ্যে বর্ত্তমান চীনের নব-অভ্যুদয়ের সূচনা নিহিত ছিল।

রাশিয়ার সঙ্গে চীনের জাতীয়তাবাদী গবর্ণমেণ্টের এই প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল। মস্কোতে বিশ্ববিশ্রুত ধনসাম্যবাদী লেনিন-সুহৃদ্ ট্রট্স্কীর সঙ্গে চিয়াংএর পরিচয় ঘটে। ট্রট্স্কী চিয়াংকে বলেছিলেন, "একদিকে অসীম ধৈর্য্য এবং আর একদিকে অসাধারণ কর্ম্মতৎপরতা, এই দু'টি সদ্‌গুণ বিপ্লবীদলের সাফল্যের পক্ষে অপরিহার্য্য—এদের মধ্যে একটি অপরটিকে বলবান্ ক'রে তোলে।" চিয়াং একথা আজও বিস্মৃত হননি।

পর-বৎসর চিয়াং দেশে ফিরে এসে ক্যাণ্টন্-এর নবপ্রতিষ্ঠিত সামরিক বিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। চিয়াং রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ে এক রুশ সৈন্যাধ্যক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। পরবর্ত্তী

কয়েক বৎসরের মধ্যেই চিয়াং নেতৃত্বের গুরুভার গ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে চীনের একমাত্র ক্ষমতাশালী জাতীয়তাবাদী দল কুয়োমিন্‌টাংএর কার্য্যকারী সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৬ সালের ১২ই মার্চ্চ সান্ ইয়াৎ সেনের মৃত্যু হয়। নিত্যধামে প্রস্থান করার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সান্ ইয়াৎ সেন তাঁর দেশবাসীকে তাঁর জীবনের পরমতম বাণী দিয়ে যান্—Save China! অসংখ্য চীনা সৈনিকদের মধ্যে চিয়াং সর্ব্বপ্রথম এই আদেশ পালন করতে ছুটে এলেন। তিনি জাতীয়তাবাদী সৈন্যদলেব প্রধান সেনাপতিরূপে চীনা বাহিনীর পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। সান্ ইযাৎ সেন চিযাংকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত ক'রে যাননি, তবে বামপন্থী ওয়াং এবং দক্ষিণপন্থী হিউ এই দু'জনের অপেক্ষা চিয়াংকেই যোগ্যতর ব'লে স্বীকার করা হ'ল। চীনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চিয়াং সাম্‌নে কোন বাধা পেলেন না।

১৯২৬ সালেই চিয়াং বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'লেন। কুয়োমিন্‌টাং দলের প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতা এতদিন শুধু দক্ষিণ চীনেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য প্রদেশে সান্ ইয়াৎ সেনকে লোকে অশ্রদ্ধা করতো, স্বপ্নবাদী ব'লে তাঁর কথায় কান দিত না এবং চিয়াংকে রুশ লালফৌজ দলের এক চপলমতি বিপ্লবী ব'লে ব্যঙ্গ করতো। সমগ্র চীনের প্রদেশে প্রদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তখনো পরস্পর পরস্পরকে বিলুপ্ত করবার মানসে একে অপরের রক্তপাত করছে। বিদেশী বণিকরা এই বিরোধের সুযোগ নিয়ে তাদের স্বার্থ-সিদ্ধি করছে। দেশের চারিদিকে এই যে দুর্নীতি এবং নীচ আত্মকলহ জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, এর শেষ হবে কবে?

চিয়াং এই সমস্ত দলগুলিকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে চীনকে ঐক্যবদ্ধ করবার সঙ্কল্প করলেন। কতকগুলি দল তাঁর পক্ষে যোগদান করলে এবং বাকী দলগুলি চিয়াংএর কামানগর্জ্জনের সম্মুখে হতবীর্য্য হয়ে আত্মসমর্পণ করলে। এই সকল বিরুদ্ধদলগুলি খুব শক্তিমান্ ছিল না। তবু চিয়াংএর এই ব্যাপক অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। চিয়াং সসৈন্যে ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে উচাং অধিকার করেন। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হ্যাংকো অধিকার করেন এবং মার্চ্চ মাসে নান্‌কিং এবং সাংহাই চিয়াংএর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৯২৮ সালের জুলাইএ চিযাং সগৌরবে পিকিং জয় করেন। চিয়াং-এর বিজয়-অভিযানে তাঁর অনুগত সেনাদল এবং তাঁর স্বোপার্জ্জিত অর্থ দুইই তাঁর শক্তি-সাহস উদ্দীপিত রেখেছে।

কুয়োমিন্‌টাংএর অধিনায়ক চিয়াং প্রায় সমগ্র চীনকে ঐক্যবদ্ধ করলেন বটে কিন্তু বিরোধ বাধলো রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ নিয়ে এবং শাসনপদ্ধতি নিয়ে। চীনের বিপ্লবীরা বৈপ্লবিক গবর্ণমেণ্ট স্থাপনায় রাশিয়ার সাহায্য পেয়েছিল এবং সেই সঙ্গে পেযেছিল রুশনেতাদের অভীপ্সিত সাম্যবাদী ভাবধারার প্রভাব। কুয়োমিন্‌টাং দলের মধ্যেই মতভেদ হ'ল। বামপন্থীরা রাশিযার সাম্যবাদী শাসনতন্ত্র চীনে প্রবর্ত্তন করতে চাইলে এবং দক্ষিণপন্থীরা তাদের জাতীযতাবাদী আদর্শ এবং সান্ ইয়াৎ সেনের ঘোষিত আদর্শ গ্রহণ ক'রে চীনকে মহিমান্বিত করতে চাইলে। চিযাং হ'লেন এই দক্ষিণপন্থী দলের নেতা, কেননা তিনি চীনের জাতিগত বৈশিষ্ট্য পরিহার ক'রে বৈদেশিক সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থার মধ্যে কোন শ্রেয়ঃ দেখতে পেলেন না। চিয়াংএর যুক্তি অনেকেই বুঝতে পারলেন এবং দক্ষিণপন্থীদলে যোগদান করলেন। কিন্তু সাম্যবাদীরাও কম ছিল না, তারা বিভিন্ন

প্রদেশ এবং সহর দখল করতে উদ্যত হ'ল। ১৯২৭ সালে চিয়াং এদের হাত থেকেই হ্যাংকো ছিনিয়ে নেন। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত চিয়াংএর জীবনেতিহাস সাম্যবাদী-দলনের একটানা নিষ্ঠুর কাহিনী।

চিয়াং যখন দাক্ষিণপন্থীদলে যোগদান করেন তখন অনেকে মনে করেন যে চিযাং চীন-বিপ্লবের আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছেন এবং সান্ ইয়াৎ সেনের স্মৃতির প্রতি অসম্মান প্রকাশ করেছেন। কিন্তু চিয়াং রাজবিদ্বেষী বিপ্লবী হ'লেও সারাজীবন একটিমাত্র আদর্শেরই দাসত্ব স্বীকার ক'রেছেন, সে আদর্শ চীনকে ঐক্যবদ্ধ সুসংহত এক মহাজাতিতে পরিণত করা। এই আদর্শে উপনীত হ'তে গেলে জাতীয়তার ভাবধারা যাতে চীনের ধনী জমিদার এবং বণিকদেরও অনুপ্রাণিত করতে পারে সেই চেষ্টা করতে হবে। এদের বাদ দিয়ে চীনকে বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের কবল থেকে উদ্ধার করা কল্পনার অতীত। সাম্যবাদীরা সকলের আগে এদেরই উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল এবং চিয়াং এদেরই আনুকূল্য সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ব'লে মনে করলেন। সাংহাই এবং ইয়াংসি উপত্যকার বিখ্যাত বণিক্‌গণ চিয়াংকে প্রচুর অর্থসাহায্য করতে লাগলেন এবং চিয়াং চীনের সাম্যবাদী লাল-বাহিনী নিশ্চিহ্ন করবার ব্রত গ্রহণ করলেন।

চিয়াং তাঁর সাম্যবাদ-বিরোধী অভিযানের ফলে অনেকগুলি সুবিধা পেয়েছিলেন। জাপানীরা এতদিন চীনকে সাম্যবাদ থেকে রক্ষা করবার অজুহাতে চীনের উপর ছোটখাটো আক্রমণ চালাতো, এখন চিয়াং সেই দায়িত্ব গ্রহণ করায় চীনের উপর জাপানী প্রভুত্ব কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হ'ল। লালফৌজের উচ্ছেদসাধন

করবার জন্যে চিয়াং একাধিক প্রদেশে অবাধে সৈন্য চালনা করতে লাগলেন যার ফলে ভবিষ্যতে তাঁর নেতৃত্ব জনপ্রিয় হ'তে পেরেছিল। চিয়াং অনবকাশ যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা তাঁর সৈন্যদলকে সুশিক্ষিত ও সহিষ্ণু ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারলেন এবং জাতীয়তার পুরোহিত হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

এদিকে বামপন্থীরা বহু খণ্ডযুদ্ধের পর চিয়াং-প্রতিষ্ঠিত কিয়াংসি প্রদেশের গবর্ণমেণ্টকে ভেঙে দিয়ে কিয়াংসিতে সাম্যবাদী শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। চিয়াং চেয়েছিলেন সাম্যবাদীদের রক্তে তাঁর যাত্রাপথ ধৌত হবে, কিন্তু তা' হ'ল না। এমন কি চিয়াং স্বয়ং সিয়ান্-এ সাম্যবাদীদের হাতে বন্দী হ'লেন। তাঁর বন্দী হওয়ার সংবাদে সমগ্র পৃথিবী উৎসুক আগ্রহে এই অভিনব ঘটনার পরিণতি প্রতীক্ষা করে, কিন্তু এক লহমায় চিয়াংএর সঙ্গে সাম্যবাদীদের সন্ধি হয়ে গেল—চিয়াং তাঁর পরম শত্রুদের নিয়েই চীনের সংযুক্ত সৈন্যদল গঠন করলেন।

চিয়াং এই বিরুদ্ধদলগুলির সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন থাকবার অভিপ্রায়ে এক গোয়েন্দা-বিভাগের সৃষ্টি করেন; এরা সদাসর্ব্বদা চিয়াংএর বিপক্ষদলের গতিবিধি চিয়াংএর গোচর করতো। সাম্যবাদীদল ব্যতীত আরও কয়েকটি সশস্ত্র রাজনৈতিক দল চিয়াংএর বিরোধিতা করে। লি সাংজেন এবং পাই চুংসি চিয়াংএর শত্রুদল-নায়কদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন।

এই অবিশ্রাম আত্মকলহের মধ্যেও চিয়াং বহু গঠনমূলক কর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করেন। অহিফেন-নিয়ন্ত্রণ তার মধ্যে চীনের জাতীয় উন্নতির প্রধান সহায়ক। প্রায় বাইশটি প্রদেশ চিয়াংএর

শাসনাধিকার অল্পবিস্তর মেনে নিলে এবং চিয়াং নান্‌কিংএ নূতন রাজধানী বা তার শাসনকেন্দ্র স্থাপন করলেন। চিয়াং তাঁর স্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এবং আগ্রহাতিশয্যে "নবজীবন আন্দোলন" নামে এক আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য চীনের নরনারীকে সংস্কারমুক্ত ক'রে তোলা, তাদের বেশভূষা আচার-ব্যবহার সভ্যজাতিসঙ্ঘের অনুমোদনযোগ্য ক'রে তোলা। চিয়াং-এর এই সামাজিক প্রচেষ্টা কামাল আতাতুর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চিয়াংএর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—তিনি চীনজাতিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, 'প্রাচীন চীন' নবীন উদ্দীপনায় জাতীয়তার আদর্শ অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করেছে শুধু চিয়াংএব বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে।

চিয়াং জীবনে সর্ব্বাধিক প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে। ১৯২১ সালে তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। তারপব মিলিং স্নং নামে এক প্রতিভাবতী কুমারীর গুণে মুগ্ধ হয়ে চিয়াং তাঁর পাণিপ্রার্থনা করেন। কিন্তু স্নং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কন্যাপক্ষ থেকে চিয়াংকে খৃষ্টান হবার জন্যে অনুরোধ করা হ'ল, কিন্তু চিয়াং যে ধর্ম্মের বিষয় কিছুই জানেন না সে ধর্ম্ম কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজী হ'লেন না; বিবাহ হ'ল আইনানুযায়ী। মাদাম কাই শেক্ স্বামীর যোগ্য সহধর্ম্মিণী ব'লে কিছুদিনের মধ্যেই খ্যাতি অর্জ্জন করেন। চীনের ইতিহাসে মাদাম অমৃতা হয়ে থাকবেন—বর্ত্তমান চৈনিক সমাজ মাদামেরই সৃষ্টি। খৃষ্টধর্ম্মের বিষয়ে পড়াশোনা ক'রে চিয়াং পরে খৃষ্টান হয়েছিলেন।

সিয়ান্-এ বিপক্ষ-দলের সঙ্গে চিয়াংএর যে সন্ধি স্থাপিত হয় তার পর থেকে চীনে আর আত্মকলহ দেখা যায়নি। চিয়াংএর

"সংযুক্ত চীন-বাহিনী" চীনকে ঐক্যবদ্ধ এবং ক্ষমতাশালী মহাজাতি ক'রে তোল্‌ল। সর্ব্বদল-সমন্বয় হওয়ার ফলে চীনে রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নানাবিধ উন্নতি সাধিত হ'ল। টাকশাল, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সুনিয়ন্ত্রিত হ'ল এবং সামরিক শক্তি সুসংহত করা হ'ল। চীনের উন্নতিকল্পে চিয়াং ডক্টর ফুং নামে তাঁর এক সহকর্ম্মীকে ইয়োরোপে প্রেরণ করলেন অর্থসংগ্রহ করতে। এদিকে চীনের পণ্যব্যবসায়ীরাও জাপানীদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে লাগলো। চিয়াং একাই চীন-জাতির ভাগ্য ফিরিয়ে দিলেন।

কিন্তু এর পরই সুরু হ'ল চীন ও জাপানের বর্ত্তমান যুদ্ধ। এ-যুদ্ধ শুধুই ঈর্ষা, নৃশংসতা এবং বর্ব্বরতার কাহিনী। চীন যেদিন থেকে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে লাগলো, ঐক্যবদ্ধ হয়ে চীনারা যেদিন থেকে সামরিক শক্তিতে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে জাপানীদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে লাগলো সেদিন থেকে জাপানের একমাত্র চিন্তা হ'ল কেমন ক'রে চীনের মূলে কুঠারাঘাত করবে, কেমন ক'রে চীনকে বিক্ষিপ্ত, বিভক্ত করবে। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না, জাপানীদেরও ছলের অভাব হ'ল না। 'এশিয়ার দুইটি প্রধানতঃ অহিংসা-ধর্ম্মাবলম্বী জাতির মধ্যে হিংসার বিষ-ক্রিয়া সুরু হ'ল।

১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই জাপানী সৈন্যেরা পিকিংএর জাপানী মহলে নৈশ কুচকাওয়াজ করছিল এমন সময় একজন জাপানী নিরুদ্দেশ হয়। জাপানীরা তখনই দাবী করে যে চীনারাই ঐ লোকটির জীবননাশ করেছে। তারা তখনই চীনাদের শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হ'ল। সেই রাত্রেই চীনাদের পাড়ায় তারা আক্রমণ করলে, গভীর নিশীথে শয্যাত্যাগ ক'রে পিকিংএর বুকে যে সকল চীনা বীরগণ তাদের রক্তদান করেছিল তাদেরই জীবন সহস্র সহস্র চীনার জীবনাহুতির প্রথম নিদর্শন।

জাপানীদের এই অতর্কিত আক্রমণে চিয়াং ভীত হ'লেন না। তিনি এবং মাদাম জানতেন যে যুদ্ধ অনিবার্য্য, কেবল তাঁরা জানতেন না সেটা এত নিকটে। ১৬ই জুলাই চিয়াং এক ওজস্বিনী বক্তৃতায় জাপানীদের পিকিং ত্যাগ করতে বলেন। চীনের বুকের উপর ব'সে তারা চীনা-রক্তপাতের উৎসব করবে এ পৈশাচিকতা নবীন চীন কিছুতেই সহ্য করবে না একথাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু জাপানীরা যখন পিকিং অধিকার করে তখন চিয়াং তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেন। তারপর আগস্ট মাসেব প্রথম সপ্তাহে সাংহাইএর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। চীনারা এই যুদ্ধে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে।

সাংহাইএর যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। নবেম্বর মাসে জাপানীরা সাংহাই জয় করে এবং ডিসেম্বর মাসে চীনের জাতীয় রাজধানী নান্‌কিং অধিকার করে। এর পর জাপানীরা বহু চীনা সহর অধিকার করেছে। কিন্তু চিয়াং এক অভিনব নীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি প্রথমে বাধা দেন, যুদ্ধ করেন, তারপর তাঁর সৈন্যদের পিছু হঠ্‌তে আদেশ দেন; আবার যুদ্ধ করেন, আবার পেছিয়ে আসেন। তাঁর উদ্দেশ্য, যাতে জাপানের প্রচুর অর্থব্যয় হয়। জাপানীদের অর্থনৈতিক অবস্থা চিযাং অবগত আছেন ব'লেই তাঁর এ নীতি সফলতা লাভ করেছে। ১৯৩৮ সালে সানটুংএর যুদ্ধে চীনা-বাহিনী জয়লাভ করে, কিন্তু হ্যাংকো জাপানীদের কবলিত হয়। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে জাপানীরা ক্যাণ্টন্ অধিকার করে।

তারপর জাপানীরা চীনাদের প্রভূত ক্ষতি সাধন ক'রে চলেছে। বহু সমৃদ্ধ নগরী, বহু রেলপথ, পণ্যবিপণি তারা অবহেলায় চূর্ণবিচূর্ণ

করেছে; বিমানপথে, স্থলপথে তারা চীনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। কিন্তু চিয়াংএর বুদ্ধির নির্ম্মলতা, তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাধারা কোনদিন এতটুকু আচ্ছন্ন হয়নি। তিনি তাঁর নির্দ্দিষ্ট সুচিন্তিত নীতি মেনে চলেছেন। একটা জাতির গঠনকার্য্য সম্পূর্ণ হ'তে না হ'তে বহিঃশত্রুর কবল থেকে তাকে মুক্ত করার এত বড় প্রচেষ্টা পৃথিবীতে বোধ করি আর কাউকেই করতে হয়নি। নিজ হাতে গড়া জাতির বীব সৈনিকদের রক্তস্রোত, গৃহে গৃহে জননীদের শোকার্ত্তনাদ চিয়াংকে বিচলিত করেছে, কিন্তু পথভ্রষ্ট করেনি। চীনের মঙ্গলেব জন্যে বিশ্বপিতার বেদীতলে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে সে রক্তের বিনিময়ে চীনকে তিনি চরম জয়শ্রীগৌরব দান করবেন এ বিশ্বাসই চীনের শ্রেষ্ঠ সম্বল।

ডি-ভ্যালেরা

পৃথিবীতে কে যে কতখানি শক্তিমান্ তা' নির্ণয় করা বোধ হয় বিধাতারও অসাধ্য। চিরদিন মানুষ শক্তির পরিমাণ করে লোকবল অর্থবল প্রভৃতি সম্পদের পরিমাণ অনুসারে। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সামরিক বাহিনী আবিষ্কার করলে যে, তাদের এই বিশ্বজয়ী রণ-সম্ভার একটিমাত্র তীক্ষ্ণধী যুবকের কাছে পরাভূত হচ্ছে, ব্যর্থ হচ্ছে ইংলণ্ডের রাজশক্তি।

এই যুবকটি আয়র্ল্যাণ্ডের মুক্তিকামী একজন গণিতবিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক ইমন ডি-ভ্যালেরা। ইনি তখন সবেমাত্র বিদ্যায়তন পরিত্যাগ ক'রে বন্দুক হাতে করেছেন; উদ্দেশ্য, সশস্ত্র বিদ্রোহ ক'রে

ইংরাজদের হাত থেকে আয়র্ল্যাণ্ডকে উদ্ধার করবেন, স্বাধীন আয়র্ল্যাণ্ড জগতে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

১৮৮২ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে ইমন ডি-ভ্যালেরা জন্মগ্রহণ করেন—আয়র্ল্যাণ্ডে নয়—নিউইয়র্ক সহরে। তাঁর পিতা ছিলেন স্প্যানিয়ার্ড এবং মাতা আইরিশ রমণী। জন্মসূত্রে ডি-ভ্যালেরা পিতার কাছ থেকে স্প্যানিয়ার্ড-সুলভ সাহস এবং বেপরোয়া ভাবের উত্তরাধিকারী হ'লেন এবং মায়ের কাছ থেকে পেলেন অকৃত্রিম আইরিশ-প্রীতি।

ডি-ভ্যালেরা আয়র্ল্যাণ্ডে মামার কাছে প্রতিপালিত হন, কেননা অতি শৈশবেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। মামার স্নেহে তাঁকে পিতার অভাব অনুভব করতে হয়নি এবং লেখাপড়া শেখারও কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। মুসোলিনী, হিট্‌লার এঁদের মত ডি-ভ্যালেরাকে কোনদিনই দারিদ্র্যের জ্বালা অনুভব করতে হয়নি। ব্যক্তিগত জীবনে এইটি তাঁর পরম সৌভাগ্য।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর পাঠে অনুবাগ অসাধারণ এবং তাঁর মত মেধাবী ছাত্র তখনকার আয়র্ল্যাণ্ডে দুর্ল্লভ ছিল। স্কুলে প্রায় দেখা যেত তিনি গোপনে তাঁর চেয়ে কোন উঁচু ক্লাশে গিয়ে একমনে পড়া শুনছেন। প্রায়ই তাঁকে উঁচু ক্লাশ থেকে ধ'রে আনতে হ'ত। যত বাজ্যের ভ্রমণকাহিনী এবং বীরপুরুষদেব জীবনী পড়াই ছিল তাঁর অপার আনন্দ। দুর্গম পথে কে কোথায় কী আবিষ্কার করতে যাচ্ছে, হানিবল আর সীজার কেমন ক'রে যুদ্ধ কবেছেন, নেপোলিয়ন কেমন ক'রে ইযোরোপের বুকে বিজয়গর্ব্বে বিচরণ করেছেন এ-সমস্ত বালক ডি-ভ্যালেবা যেন চোখের সাম্‌নে দেখতে পেতেন। তাঁর মেধা যেমন ক্ষুরধার ছিল তেমনি প্রখর ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি। তাঁর পকেটে

সর্ব্বদাই একখানা নেপোলিয়নের জীবনী কিংবা ফরাসী গল্পলেখক ডুমার একখানা রোমাঞ্চকর উপন্যাস থাক্‌তো। "থ্রী-মাস্কেটীয়ার্স্"-এর কোন কোন পরিচ্ছেদ তিনি অনায়াসে মুখস্ত ব'লে যেতে পারতেন।

এদিকে খেলাধুলায় তাঁর জোড়া ছিল না। স্প্যানিয়ার্ড পিতার ছেলে তিনি, কাজেই খেলার মাতামাতিব প্রতি আকর্ষণ তাঁর স্বাভাবিক। বৃদ্ধ গ্রামবাসীরা গল্প করে যে, প্রায়ই সদলবলে ডি-ভ্যালেরা অন্য গ্রামে খেলায় জয়লাভ ক'রে জয়োল্লাস করতে করতে গভীর রাত্রে গ্রামে ফিরতেন—লোকের ঘুম ভেঙে যেত। বিজয়ী বীরের মতো ডি-ভ্যালেরার তখন সে কী উল্লাস!

কিন্তু যে ছেলেটি খেলাধুলায় এম্‌নি মেতে থাকে, রবিবার দিন সকালে দেখা যেত সে নিতান্ত শান্ত ছেলেটির মতো অনন্যমনা হয়ে গম্ভীরমুখে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গীর্জ্জায় অসংখ্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মাঝে ব'সে উপাসনা শুনছে। উপাসনায় কথা বলার ধরণ, ভাব-ভঙ্গী তাঁর বড় ভালো লাগতো। এই উপাসনায় যোগদানের ফলেই তিনি প্রথম বক্তৃতা দিতে শেখেন। সেই সময় থেকেই দুরন্তপনায়, শিষ্টাচারে, পাঠানুরাগে, এই বিচিত্র বালক সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

ছাত্রজীবনে তাঁর কৃতিত্বের কথা তাঁর অধ্যাপকগণ সগর্ব্বে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। পরাধীন জাতির ভাগ্যে কৃতিত্বের কোন মূল্য নেই, শাসকগণ বিজিত জাতির সর্বকিছুই ঘৃণার চক্ষে দেখে' আনন্দ পান। কিন্তু ডি-ভ্যালেরার কৃতিত্ব ছাত্রজীবনের বহু উর্দ্ধে উঠে' যেদিন বিশ্বলোকের প্রশংসা লাভ করলে সেদিন বিজিত জাতির দৈন্য সত্যি সত্যি দূরীভূত হ'ল।

তাঁর মেধা এবং মনীষার প্রতি তাঁর অধ্যাপকগণের এমনই আস্থা ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে করতেই তাঁকে ইণ্টার-

মিডিয়েট্‌ কলেজে অধ্যাপনা করতে দেওয়া হ'ল। এর পরই যখন রকওয়েল কলেজে অনার্স সিনিয়র গ্রেডের ক্লাশে তাঁকে গণিতশাস্ত্রের এবং পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করা হ'ল তখনো আসলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সত্যিকারের প্রতিভার কাছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং না হওয়া তুইই সমান নিরর্থক।

অধ্যাপনা করতে করতে তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগে গবেষণা করতেন। সকলের বড় বিস্ময় এই যে, তিনি বিজ্ঞানী হয়েও ইয়োরোপীয় প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণা করেন এবং পণ্ডিতগণ তাঁকে বিশেষজ্ঞ ব'লে অভিনন্দিত করেছিলেন। একদিকে পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রে এবং অন্যদিকে ইয়োরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে, গ্রীক্‌, লাতিন ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বর্ত্তমান ইয়োরোপের জননায়কগণের মধ্যে ডি-ভ্যালেরার প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা পৃথিবীর লোকের কাছে আদর্শ হয়ে আছে।

অধ্যাপক ডি-ভ্যালেরার জীবনে কোথাও কোন চাঞ্চল্য ছিল না। তাঁর যা'কিছু বিস্ময়, যা'কিছু রোমাঞ্চ তা' তখনও তাঁর পাঠাগারের গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মাঝে মাঝে বন্দুক হাতে একা শিকার করতে বেরিয়ে পড়েন। বন্দুকটি তাঁর বড় প্রিয় মনে হয়, পরম যত্নের সঙ্গে তিনি বন্দুকটিকে কাছে কাছে রাখেন। আর এক এক সময় বন্ধুদের ডেকে বলেন, "দেখ, বোধ হয় আমি সৈনিক হবো—নইলে, অধ্যাপক মানুষের আবার এত বন্দুক হাতে করতে ভালো লাগে কেউ কোথাও শুনেছ ?"

অকস্মাৎ একদিন তাঁর শান্তিময় জীবনের মাঝে বন্যার মতো আয়র্ল্যাণ্ডের ডাক এসে সবকিছু ভাসিয়ে দিলে। তাঁকে বন্দুক

হাতেই বেরিয়ে পড়তে হ'ল—সৈনিকরূপে নয়, বিদ্রোহী আইরিশ বাহিনীর পরোভাগে, তাদের নেতারূপে।

বহুদিন থেকে আয়র্ল্যাণ্ড ইংরাজ-শাসনের কঠিন শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্ম আন্দোলন ক'রে আস্‌ছিল। বহু রক্তপাত হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয়নি। বিগত মহাযুদ্ধের সময় যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত বিপন্ন এবং শত্রুনিধনে ব্যাপৃত এহেন সময়ে কতকগুলি বেপরোয়া দুর্দ্দান্ত আইরিশ যুবক মিলে' সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। বিদ্রোহীরা অনেক দূর এগিয়েছিল, তারা ইংরাজদের শত্রু জর্ম্মানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে অস্ত্র-শস্ত্র আনিয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিল। তাদের মাতৃভূমিকে তারা মুক্ত করবেই এই তাদের একমাত্র পণ।

১৯১৬ সালের ২০শে এপ্রিল ঈস্টার উৎসবের দিন তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। সে কী ভীষণ কাণ্ড! ব্রিটিশ সৈন্সবাহিনী আর সশস্ত্র পুলিশ বিদ্রোহীদের উপর যথেচ্ছ গুলি চালাতে লাগ্‌লো। বিদ্রোহীরাও বেপরোয়া হয়ে তাদের অস্ত্র-শস্ত্রের সদ্ব্যবহার করতে লাগ্‌লো। একদিনে আয়র্ল্যাণ্ডের বুকের উপর ঝড় বয়ে গেল। দু'পক্ষেরই বহু প্রাণনাশ হ'ল। কিন্তু অবশেষে বিদ্রোহীরা তাদের স্বল্প সমরোপকরণ সমেত ধৃত হ'ল। ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অধ্যাপক ডি-ভ্যালেরা। বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করবার কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁকে তারা তাদের নেতৃপদে বরণ ক'রে নিয়েছিল। বিদ্রোহীদের এই নতুন নেতাটিকে সরকার-পক্ষও সুনজরে দেখতেন না—এই লোকটি ইতিমধ্যেই তাঁদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ডি-ভ্যালেরা ধরা পড়েছেন শুনে গবর্ণমেণ্ট স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁকে ইংলণ্ডের বিখ্যাত জেলখানা লিন্‌কল্‌ন্‌স্‌-এ রাখা হ'ল।

আয়র্ল্যাণ্ডের ইতিহাসে এই "ঈস্টার বিদ্রোহ" একটি স্মরণীয় ঘটনা।

হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে ডি-ভ্যালেরার পলায়নের সংবাদ প্রচারিত হ'ল। জগদ্‌বাসী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল যে, আয়র্ল্যাণ্ডের জার্ম্মান প্লটের নেতা, ঈস্টার বিদ্রোহের প্রধান আসামী ডি-ভ্যালেরা লিন্‌কল্‌ন্‌স্‌ কারাগার থেকে পলায়ন করেছেন —কেমন ক'রে এবং কোথায় কিছুই জানা যাচ্ছে না!

ইতিপূর্ব্বেই ডি-ভ্যালেরা এই দুঃসাহসী বিদ্রোহীদলের নেতারূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই পলায়নের সংবাদে সারা জগতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর অসমসাহসিকতায় পৃথিবীর কাছে তিনি সহানুভূতি পেলেন এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে তিনি বিশ্ববাসীর কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা পেয়েছেন এইদিন থেকে তারও সূত্রপাত হ'ল।

লিন্‌কল্‌নস্‌ কারাগারে প্রহরীর কড়া ব্যবস্থা ছিল। তার মধ্য থেকে তাঁর পলায়নে ব্রিটিশ পুলিশ-বিভাগ এবং গোয়েন্দা-বিভাগ অত্যন্ত লজ্জিত হ'লেন। বাহিরের সর্ব্বপ্রকার সংস্রব থেকে বন্দীদের সরিয়ে রাখা হ'ত। আত্মীয়-স্বজনকে পর্য্যন্ত দেখা করতে দেওয়া হ'ত না। ডি-ভ্যালেরার স্ত্রী প্রায় নয়মাস ধ'রে গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন-নিবেদন ক'রে তবে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলেন। এত সতর্কতা, এইরকম কঠিন পাহারার ভিতর থেকে সকলের অগোচরে ডি-ভ্যালেরা কেমন ক'রে উধাও হ'লেন? তিনি কি জাদু জানেন?

এইবার তাঁর পলায়নের কাহিনীটা বলি।—

জেলে বন্দীদের ছবি আঁক্‌তে দেওয়া হ'ত। ছবি আঁকার মধ্যে আর কী থাক্‌তে পারে। নিতান্তই নিরীহ শিল্পচর্চ্চা মাত্র; কাজেই

ছবি আঁকার কোন বাধা ছিল না। ডি-ভ্যালেরা ছবি আঁক্‌তেন। কী করবেন, সময় কাটাতে হবে তো।

বড়দিনের ছুটিতে দু'খানি ছবি এঁকে তিনি জেলরকে বল্লেন তিনি এই ছবি দু'খানি তাঁর এক বন্ধুকে বডদিনের উপহার দিতে চান, তিনি যেন দয়া ক'রে ছবি দু'খানা যথাস্থানে পাঠিয়ে দেন। জেলর দেখলেন ছবি দু'খানি সাধারণ ব্যঙ্গচিত্র। একখানিতে একজন মাতাল নিজের ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিছুতেই দরজা খুল্‌তে পারছে না। আর একখানিতে একটা লোক বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে যাবার চেষ্টা করছে, হাতে তার মস্ত একটা চাবি, কিন্তু দরজা বাইরের দিক থেকে বন্ধ। প্রথম ছবিখানির নীচে লেখা "দরজা খুল্‌ছে না যে!" আর দ্বিতীয় ছবিখানির নীচে লেখা, "বেরই কেমন ক'রে?"

ছবি দু'খানির মধ্যে যে একটা নিগূঢ় সঙ্কেত ছিল তা জেলর সাহেবের মাথায় আসেনি। তিনি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলেন।

ডি-ভ্যালেরা একজন পাকা বৈজ্ঞানিক ছিলেন এবং অঙ্কে তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। তিনি এতদিন ধ'রে জেলের চাবির কল-কব্জা সমস্ত লক্ষ্য ক'রে ছবিতে ঠিক জেলের চাবির মতো চাবি এঁকে পাঠিয়ে দিলেন।

ছবি দু'খানি ডি-ভ্যালেরার সহকর্ম্মী মাইকেল কলিন্সের হাতে গিয়ে পড়লো। এই মাইকেল কলিন্স্-এর যেমন সাহস ছিল তেমনি ছিল বুদ্ধি। তিনি সঙ্কেত বুঝলেন। ছবি দেখে' অনুরূপ চাবি তৈরি ক'রে তিনি কেকের মধ্যে পূরে' সেই চাবিসুদ্ধ কেক্ বন্ধুকে উপহার দিলেন। জেলর বড়দিনে বন্ধুর দেওয়া উপহার সেই কেক্‌টি ডি-ভ্যালেরার হাতে দিলেন। সেইদিনই গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে

মাইকেল কলিন্স এবং হ্যারিবোলাণ্ড নামে আর একজন বিপ্লবী গাড়ি নিয়ে জেলের পিছনে লুকিয়ে রইলেন। ডি-ভ্যালেরা বেরিয়ে এলেন নিঃশব্দে—তিন বন্ধুতে নিমেষে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন!

এই হ'ল ডি-ভ্যালেরার পলায়নের ইতিহাস!

পৃথিবীতে এই আইরিশ বিদ্রোহীদের তুলনা নেই। এদের সিন্‌ফিন্ বলা হ'ত। ব্রিটিশ গোয়েন্দা-বিভাগ পর্য্যন্ত এদের কাছে নিতান্ত শিশু। মাইকেল কলিন্স্ এমনি সাহসী ছিলেন যে তিনি ছদ্মবেশে ব্রিটিশ গোয়েন্দা-মহলে ঢুকে তাদের কার্য্যপদ্ধতি জেনে আসতেন, কেউ জান্‌তেও পারতো না।

এই সিন্‌ফিন্‌দের রীতিমতো একটা রাজত্ব চল্‌তো। তাদের আশ্চর্য্য কৌশলের কথা ডিটেক্‌টিভ্ গল্পকেও হার মানিয়ে দেয়। তাদের নিজেদের গোয়েন্দা-বিভাগ, পোস্ট অফিস্, সব ছিল। বিচিত্র কৌশলে তারা অবাধে তাদের কাজ চালিয়ে যেতো। ডি-ভ্যালেরাকে তারা এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল যে ব্রিটিশ গোয়েন্দা কিছুতে খুঁজে বার করতে পারেনি। চারিদিকে যখন ডি-ভ্যালেরাকে ধরবার জন্য কড়া ব্যবস্থা তখন ডি-ভ্যালেরার সঙ্গে সংবাদপত্রের লোকদের সাক্ষাৎ হ'ত, তিনি তাদের মারফৎ বাণী পাঠাতেন—খবরের কাগজে এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ ছাপা হ'ত, অথচ যারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো তারাও বল্‌তে পারতো না যে ডি-ভ্যালেরা কোথায় আছেন।

এদিকে সিন্‌ফিন্ দল যেখানে-সেখানে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাতো। গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত বিব্রত হ'লেন। তাঁরা কঠোর হস্তে বিদ্রোহীদের দমন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। বরং সিন্‌ফিন্ দলের শক্তি আরও বাড়তে লাগলো।

খবরের কাগজে ডি-ভ্যালেরার যে সব বাণী ছাপা হ'ত তাতে আয়র্ল্যাণ্ডের লোকদের মনে যথেষ্ট উত্তেজনার সঞ্চার হ'ত। এই লোকটিকে ঘিরে যে রহস্যজালের সৃষ্টি হ'ত তাতে দেখতে দেখ্তে সিন্‌ফিন্ দলের ক্রিয়া-কলাপ অনুধাবন করতে করতে তারা অজ্ঞাতে আয়র্ল্যাণ্ডের এই বিদ্রোহের সমর্থন করতো। বিদ্রোহী ডি-ভ্যালেরাকে তারা যেদিন ভালোবাস্‌লে সেদিন সিন্‌ফিন্ বিদ্রোহকেও তারা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করলে।

এমনি ক'রে নব নব উত্তেজনার মধ্যে দিন কাট্‌তে লাগলো। এরই মধ্যে ১৯১৮ সালের ২২শে মার্চ্চ তারিখে সিন্‌ফিন্ দলের প্রধান আড্ডা থেকে ঘোষণা করা হ'ল যে, আগামী বুধবার ২৬শে তারিখে সভাপতি ডি-ভ্যালেরা আয়র্ল্যাণ্ডের জনসাধারণকে স্বয়ং দেখা দেবেন, ঐ দিন তাঁর অজ্ঞাতবাসের অবসান ঘট্‌বে।

খবরটি প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি হ'ল। উত্তেজনা এবং ভাবাতিশয্যে আইরিশদের চেহারা যেন বদ্‌লে গেল। গবর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে নানাস্থানে সভা-সমিতির আয়োজন হ'তে লাগলো—তাদের বীর জননায়ককে তারা অভিনন্দিত করবে। গবর্ণমেণ্ট বিপদ দেখে' সভা-সমিতি ও উৎসব-আয়োজন বন্ধ ক'রে দিলেন। আইরিশদের এই উত্তেজনা এবং গবর্ণমেণ্টের এই কঠোরতা দেখে' ডি-ভ্যালেরা ব'লে পাঠালেন যে, উৎসবের কোন প্রয়োজন নেই, আইরিশদের এই শ্রদ্ধা এই প্রীতিই তাঁকে অভিনন্দিত করেছে।

এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য ক'রে আয়র্ল্যাণ্ডের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে যে আলোড়ন হ'ল তাকে সিন্‌ফিন্‌গণ শুভ সূচনা ব'লে গ্রহণ করেছিল।

এদিকে ডি-ভ্যালেরার অসামান্য গঠন-দক্ষতা, অক্লান্ত চেষ্টা এবং অভিনব ব্যক্তিত্বের বলে সিন্‌ফিন্‌ দল রীতিমতো শক্তিশালী সামরিক দলে পরিণত হ'ল। ডি-ভ্যালেরার অধিনায়কত্বে নানাবিধ সমরকৌশল আয়ত্ত ক'রে তারা ব্রিটিশবাহিনীর দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে। ১৯১৯ সালের ২১শে জানুয়ারী তারা স্বাধীনতা-দিবস উদ্‌যাপিত করলে। নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করা হ'ল। বিদ্রোহীদের নবগঠিত শাসন-সভার সভাপতি হ'লেন ডি-ভ্যালেরা।

শাসন-সভা গঠন ক'রে তাদের প্রথম কাজ হ'ল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে কর দেওয়া বন্ধ করা। সিন্‌ফিন্‌দলের স্পর্দ্ধা দেখে' ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্রুদ্ধ হ'লেন। তাঁরা এক দুর্দ্ধর্ষ সেনাদল গঠন করলেন সিন্‌ফিনদের দমন করবার জন্য। এই সেনাদলকে "ব্ল্যাক্ এণ্ড ট্যান্" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সিন্‌ফিন্‌রা এদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে লাগলো এবং এই সকল যুদ্ধের বিবরণ আয়র্ল্যাণ্ডে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলে।

ছোট আয়র্ল্যাণ্ড দ্বীপটি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অবিচ্ছেদ প্রহরী এবং সৈন্যশ্রেণী দিয়ে ঘিরে রাখলেন। ব্রিটিশ রণতরী প্রবল প্রতাপে আয়র্ল্যাণ্ডের উপকূল রক্ষা করছে যাতে সিন্‌ফিন্‌ দলের সঙ্গে বাইরের কোন সংস্রব না থাকে—কেউ যাতে আয়র্ল্যাণ্ডের বাইরে যেতে না পারে। তারই মধ্যে থেকে হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল ডি-ভ্যালেরা অদৃশ্য হয়েছেন। চারিদিকে জল্পনা-কল্পনা চল্‌তে লাগলো—গবর্ণমেণ্টের মাথায় যেন বজ্রপাত হ'ল। কী ভীষণ ধূর্ত্ত এই লোকটা! এত আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে গেল!

স্বতন্ত্র শাসন-সভা গঠন ক'রে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চালাতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। অত টাকা আস্‌বে কোথা থেকে? কিছু দিন পরে

খবর পাওয়া গেল ডি-ভ্যালেরা আমেরিকায় গিয়ে টাকা সংগ্রহ করছেন। গবর্ণমেণ্টের লোকেরা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা ঠিক করলে, ফেরার পথে লোকটাকে যে কোন উপায়ে ধরতে হবে, তারপরে যাবজ্জীবন কয়েদ।

এদিকে আমেরিকায় রীতিমতো সাড়া প'ড়ে গেল। সেখানকার বহু ধনী তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানালেন। তাঁরা ডি-ভ্যালেরার কল্পনাতীত কার্য্যকলাপের কথা পূর্ব্বেই শুনেছিলেন, এখন ব্যক্তিগত ভাবে এই লোকটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁবা তাঁর মিষ্ট ব্যবহারে, রহস্যে আলাপে মুগ্ধ হযে গেলেন। আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌রা ডি-ভ্যালেরাকে তাদের চ্যাপডা দ্বীপে নিয়ে গিযে মহাসমারোহে তাঁকে তাদের দ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নায়কের উপাধিতে ভূষিত করলে। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি থিওডোর রুজভেল্ট এই উপাধি পেয়েছিলেন।

আমেরিকার কাজ শেষ ক'রে ডি-ভ্যালেরা গোপনে আমেরিকা ত্যাগ করলেন। তাঁকে এবং তাঁর বিখ্যাত অনুচর মাইকেল কলিন্সকে ধরবার জন্য গোয়েন্দা-বিভাগের লোকেরা সর্ব্বদাই সতর্ক থাক্‌তো। কিন্তু তাঁরা চোখে ধূলো দিয়ে ঠিক নিজেদের কাজ ক'রে যেতেন। ডি-ভ্যালেরার আমেরিকা-ত্যাগের সংবাদ পেযে গোয়েন্দা-মহলে ভীষণ কাজের তাড়া প'ড়ে গেল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তারা ডি-ভ্যালেরার আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু ডি-ভ্যালেরা নিরাপদে আয়র্ল্যাণ্ডে এসে পৌছলেন। গোয়েন্দা-বিভাগ খবরের কাগজে দেখলে, ডি-ভ্যালেরা তাঁর আমেরিকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে বাণী দিয়েছেন।

বলপ্রয়োগ ক'রে দমননীতির দ্বারা যখন সিন্‌ফিন্‌দের উচ্ছেদ করা গেল না, বরং তাদের শক্তি এবং সাহস বেড়ে চল্‌তে লাগ্‌লো,

তখন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ সন্ধির প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন। কিন্তু ডি-ভ্যালেরা জানালেন যে, আয়র্ল্যাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন সর্ত্তে তিনি সন্ধি করতে প্রস্তুত নন।

অবশেষে অনেক বাদানুবাদ অনেক চিঠি-লেখালিখির পর তিনি লণ্ডনে এক প্রতিনিধিদল পাঠাতে স্বীকৃত হ'লেন। মাইকেল কলিন্স, আর্থার গ্রিফিথ এবং আরও তিনজন সিন্‌ফিন্‌ দলপতিকে ডি-ভ্যালেরা লণ্ডনে পাঠালেন সন্ধির সর্ত্ত আলোচনা করবার জন্য। ডি-ভ্যালেরা এঁদের শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন যে, এঁরা কিছুতেই যেন ইংলণ্ডের আনুগত্য স্বীকার না করেন।

১৯২১ সালের ৫ই ডিসেম্বর রাত্রে আইরিশ প্রতিনিধি সন্ধির খসড়া সম্বন্ধে শেষ আলোচনা কবলেন। ঐ সন্ধির খসড়ায় একটি সর্ত্ত ছিল যে ইংলণ্ড আয়র্ল্যাণ্ডকে কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার মতো স্বায়ত্তশাসন দিতে প্রস্তুত বটে, কিন্তু এই নূতন আইরিশ শাসনপরিষদের প্রত্যেক সভ্যকে ইংলণ্ডের রাজার আনুগত্য স্বীকার ক'রে শপথ করতে হবে।

ডি-ভ্যালেরার প্রতিনিধিরা এ-সর্ত্তে সন্ধি করতে রাজী হ'লেন না। কিন্তু কূটনীতিজ্ঞ লয়েড্‌ জর্জ্জের সঙ্গে চাতুর্য্যে তাঁরা পেরে উঠবেন কেন? লযেড্‌ জর্জ্জ তাঁদের জানালেন যে সেই রাত্রেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর না করলে পরদিন প্রভাতে ইংলণ্ড আয়র্ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবং তাঁদের স্বাক্ষর করতে হবে ডি-ভ্যালেরার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে!

বাধ্য হয়ে প্রতিনিধিগণ ডি-ভ্যালেরার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই সেই রাত্রেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র মিঃ চিল্‌ডারস্‌ তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ টিঁক্‌লো না। সন্ধি হয়ে গেল।

এই প্রতিনিধিরা যখন আয়র্ল্যাণ্ডে ফিরে এলেন তখন ডি-ভ্যালেরা এবং সিন্‌ফিন্ দলের অন্যান্য কর্ম্মীরা খুবই মর্ম্মাহত হ'লেন। কিন্তু এই প্রতিনিধিগণ এবং তাঁদের সমর্থকগণ তখন ইংলণ্ডের এই দানকেই শিরোধার্য্য ক'রে আয়র্ল্যাণ্ডের শাসন-ভার গ্রহণ করতে ব্যগ্র। তাঁরা সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করলেন। সিন্‌ফিন্‌দের ইতিহাসে নব অধ্যায়ের সূচনা হ'ল।

আর্থার গ্রিফিথকে সভাপতি ক'রে "আইরিশ ফ্রী স্টেট্" গঠিত হ'ল। কিন্তু ডি-ভ্যালেরা সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী ইংলণ্ডের রাজার আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকার করলেন এবং "আইরিশ ফ্রী স্টেটে"র সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্ম্মী মাইকেল কলিন্স হ'লেন নবগঠিত রাজ্যের প্রধান সেনাপতি!

এমনি ক'রে যাঁরা এই দীর্ঘদিন একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, সর্ব্বপ্রকার বিপদ হেলায় তুচ্ছ ক'রে অসীম বীরত্বের সঙ্গে প্রাণ পণ ক'রে এসেছেন তাঁদেরই মধ্যে মতবিরোধ ঘট্‌লো। সিন্‌ফিন্ দলের মধ্যে দু'টি দল হয়ে গেল—একদল হ'ল শাসক আর একদল হ'ল শাসিত!

এর পরে কয়েক মাসের ইতিহাস রক্তসিক্ত। ডি-ভ্যালেরার পূর্ণস্বাধীনতা-বাদীদল এবং কলিন্স্‌এর ফ্রীস্টেট্-কামী দলের মধ্যে পথে-প্রান্তরে তুমুল বিরোধ চল্‌তে লাগলো। ক্ষিপ্ত হয়ে তারা একে অন্যের রক্তপাত করতেও দ্বিধা করলে না। এই হানাহানির মাঝে বহু আইরিশ বীরের প্রাণনাশ ঘট্‌লো। এমন কি মাইকেল কলিন্স্‌ও এক গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন। বিদেশীর কবল থেকে মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন করার পবিত্র ব্রত এতদিন যারা

জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত ব'লে গ্রহণ করেছিল আজ বোধ করি তারা জন্মভূমিব অভিষেক করলে তাদের ভ্রাতৃরক্তে, হীন গুপ্তহত্যায়!

প্রত্যেক পরাধীন জাতির ভাগ্যই একরকম। স্বদেশের মুক্তি-কামনায় যারা বিদেশীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে—স্বজাতিদ্রোহী স্বার্থান্বেষীর দল তাদের পথ আরও দুর্গম ক'রে তোলে। ডি-ভ্যালেরা এতদিন যুদ্ধ ক'রে এসেছেন ব্রিটিশ-রাজসরকারের সঙ্গে, আজ স্বদেশ-বাসীর বিরুদ্ধে তাঁকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হ'ল। আয়র্ল্যাণ্ডের পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করলে তাদের অতীত-জীবন যতই কেন গৌরবজনক হোক না, তাদের ডি-ভ্যালেরা দেশের শত্রু ব'লে মনে করলেন। তিনি সরকার-পন্থী ব্রিটিশ-আশ্রিত স্বদেশী দলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চালাতে লাগলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, শাসনযন্ত্র অধিকার করার লোভে গ্রিফিথের দল বিদেশীর কাছে তাঁদের মাতৃভূমিকে বিক্রয় করেছে। কিন্তু এই বিদ্রোহ সরকারপন্থীরা সহ্য করলেন না, তাঁরা ডি-ভ্যালেরাকে গ্রেফতার করলেন। বিচারে ডি-ভ্যালেরার এক বৎসর কারাদণ্ড হ'ল। স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বদেশবাসীর বিচারে তাঁর হাতে শৃঙ্খল পড়লো।

এক বৎসর পরে জেল থেকে বেরিয়ে তিনি এক নূতন দল গঠন করলেন, তার নাম "ফিয়ানাফেল"। এই দলের শক্তি সঞ্চয় করতে বেশি বেগ পেতে হ'ল না। ডি-ভ্যালেরা প্রবলভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন চালাতে লাগলেন এবং তাঁর সেই বিশ্ববিজয়ী ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে আয়র্ল্যাণ্ড আবার ধীরে ধীরে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হ'তে লাগলো। ১৯২৭ সালের শাসন-পরিষদের নির্ব্বাচনে তাঁর দলের চুয়াল্লিশ জন এবং তিনি স্বয়ং সভ্য নির্ব্বাচিত হ'লেন। এই নির্ব্বাচনে তিনি বুঝলেন স্বাধীন আয়র্ল্যাণ্ডের জন্মদিন সুদূর নয়।

এতদিন তিনি শাসন-পরিষদের বাইরে থেকে আন্দোলন ক'রে এসেছেন, এইবার তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের শাসন-রজ্জু ছিনিয়ে নেবার আয়োজন করতে লাগ্‌লেন। আইনের সাহায্যেই তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতিকে পরাভূত করবেন, এই হ'ল তাঁর পণ। শীঘ্রই তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'ল, ১৯৩২ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে তাঁর দলই সংখ্যায় বেশি হওয়ায় তিনিই আয়র্ল্যাণ্ডের ফ্রী-স্টেটের সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'লেন।

কৃতী ছাত্র, সুপণ্ডিত অধ্যাপক, চিরবিদ্রোহী বীর ডি-ভ্যালেরা আয়র্ল্যাণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'লেন!

সভাপতি হয়েই তিনি বিদ্রোহের চরম করলেন। যে সব কারণের জন্য তাঁকে প্রিয় বন্ধুদের বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়েছিল সেই কারণ সর্ব্বপ্রথম দূরীভূত করলেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধির সর্ত্তানুসারে রাজার আনুগত্য স্বীকার ক'রে যে শপথ গ্রহণ করতে হ'ত তিনি ঐ প্রথা তুলে দিলেন। এতদিন ইংলণ্ডের একজন রাজ-প্রতিনিধি আয়র্ল্যাণ্ডে থাকতেন ডি-ভ্যালেরা এ-ব্যবস্থা অসম্মানসূচক ব'লে রাজপ্রতিনিধি রাখতে অস্বীকার করলেন। ইংরাজীভাষার পরিবর্ত্তে মাতৃভাষার প্রবর্ত্তন ডি-ভ্যালেরার আর এক কীর্ত্তি। সর্ব্বোপরি তিনি সগর্ব্বে ঘোষণা করলেন যে, ভাষা, সংস্কৃতি এবং জাতীয় ঐতিহ্য বিচার ক'রে আয়র্ল্যাণ্ড নিজেকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র এক জাতি ও রাষ্ট্র ব'লে ঘোষণা করছে, এবং পৃথিবীর মানচিত্রে যতদিন আয়র্ল্যাণ্ডের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাক্‌বে ততদিন সে তার পূর্ণ-স্বাধীনতা রক্ষা করবে এবং তার বিশিষ্টতা, তার সংস্কৃতি, তার স্বাজাত্য-অভিমান অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বে।

বিপুল জনসংখ্যা নয়, বিরাট আয়তন নয়, অতীতের গৌরবগাথা নয়—পরপদলেহী শৃঙ্খলিত জাতির সকলের বড় প্রয়োজন একজন

অলোকসামান্য বীর্য্যবান্ বিরাট পুরুষ। যুগে যুগে দেশে দেশে এই সমস্ত মহাপুরুষ ধরিত্রীর ভার হরণ করেছেন, নিপীড়িত জাতির শৃঙ্খল দিয়েছেন চূর্ণ ক'রে। ক্ষুদ্র দেশ হ'লেও আয়র্ল্যাণ্ডের ভাগ্যে ডি-ভ্যালেরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাই আজ দেখি আয়র্ল্যাণ্ডের বুকে স্বাধীনতার পতাকা নবজাগ্রত সূর্য্যকিরণে ঝল্‌মল্ করছে!

স্বাধীন আয়র্ল্যাণ্ডকে আমরা নমস্কার করি।

লেনিন

পৃথিবীর বিস্ময় বর্ত্তমান্ রাশিয়া! এশিয়ার পূর্ব্ব সীমান্ত থেকে মধ্য-ইয়োরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট সাম্রাজ্য পরিচালনা করছে কতকগুলি কৃষক আর মজুরদের সর্দ্দার! এই দেশটির মধ্যে বর্ণ, ধর্ম্ম এবং উপজীবিকা নির্ব্বিশেষে সকলেই এক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান নেই, ঐশ্বর্য্যমদ-গর্ব্বিত রাজপুরুষ আর ধনিকের কৃপা ভিক্ষা ক'রে কেউ বেঁচে থাকে না এবং শুধু ধর্ম্মমতের জন্য একে অপরের সর্ব্বনাশ কামনা করে না। পরিশ্রম করতে হয় সকলকে এবং প্রত্যেক লোকের শ্রমলব্ধ উপার্জ্জন রাষ্ট্র গ্রহণ করে এবং যোগ্যতা অনুসারে সকলের মধ্যে জাতির সম্মিলিত উপার্জ্জন বণ্টন ক'রে দেয়। ব্যক্তিগত সম্পদ্ সে দেশে পাপ ব'লে গণ্য হয়, বণিকের আচরণ সেখানে পরস্বাপহরণের মতোই ঘৃণ্য অপরাধ।

কেমন ক'রে এই আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্ভব হ'ল? বহু বর্ষ ধ'রে সমগ্র পৃথিবীর চিন্তানায়কগণ যে আদর্শ-রাজ্যের কল্পনা ক'রে গেছেন আজ তা' বাস্তবে পরিণত হ'ল কোন্ মন্ত্রবলে? কে সেই মন্ত্রদাতা?

আজ পৃথিবীর লোকে বার বার এই প্রশ্ন করছে, উত্তরে রাশিয়া শুধু একটিমাত্র নাম উচ্চারণ করে, "লেনিন" !

প্রপীড়িত, নির্য্যাতিত রাশিয়ার চরম দুর্গতির দিনে ১৮৭০ সালে ভল্‌গা নদীর তীরে শিম্ বারস্‌ক্ নগরে লেনিন জন্মগ্রহণ করেন। লেনিন এঁর ছদ্মনাম, আসল নাম ভ্লাগিমির ইলিইচ্ উলিয়ানভ; কিন্তু এই ছদ্মনামেই তিনি জগতের কাছে পরিচিত।

লেনিন দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি। অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের মতো তাঁকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার জন্য ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি যে-শিক্ষা লাভ করলেন সে শিক্ষার দৃপ্ততেজে রাশিয়ার অত্যাচারী শাসক-কুল ভস্মীভূত হয়ে গেল।

ছেলেবেলা থেকেই লেনিন গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে ছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁর যেমনি ছিল একাগ্র নিষ্ঠা, তেমনি ছিল তাঁর সব কাজের শৃঙ্খলা। অতি বাল্যকাল থেকেই ঘড়ির কাঁটার মতো তিনি তাঁর দৈনিক কাজ ক'রে যেতেন। ভোরবেলায় এক গাদা মোটা বই আর একটা অভিধান ঘাড়ে ক'রে বালক লেনিন বেরিয়ে পড়তেন লেখাপড়া করতে। পথের কোন একটা সরাইখানায় ব'সে চা খেয়ে নিয়ে কোন এক নির্জ্জন বাগান, বন কিংবা নদীর নির্জ্জন তীরে ব'সে পড়তে শুরু করতেন। তাঁর পড়া ব'লে দেওয়ার একমাত্র সাথী ছিল ঐ মোটা অভিধানটি। যে বইটি পড়তেন তার প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ না জেনে তিনি ছাড়তেন না এবং যা' বুঝতেন তা' বইয়ের মার্জ্জিনে নোট ক'রে নিতেন। না বুঝে তিনি কিছুই গ্রহণ করতেন না এবং তাঁর অধ্যবসায়ের জোরে কোন কিছুই দুর্ব্বোধ্য থাকতো না। নিজের চেষ্টায় এমনি ক'রে লেখাপড়া করতে করতে তাঁর এমনই সুদৃঢ় আত্ম-

বিশ্বাস জন্মেছিল যার বলে তিনি পরবর্ত্তী জীবনে বিপুল ঝড়ঝঞ্ঝা এবং বজ্রপাত উপেক্ষা ক'রে আপনার পথে এগিয়ে যেতেন, কোন শক্তিই তাঁকে প্রতিহত করতে পারেনি।

লেনিনের দাদা আলেকজাণ্ডার উলিয়ানভ্ রাশিয়ার বিপ্লবী দলের মধ্যে একজন নেতা ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে রাশিয়ার জারের অত্যাচার এবং প্রজাদের দুর্দ্দশার কথা শুনতে শুনতে তাঁরও মনে বিদ্রোহের বাসনা জেগে উঠতো। যেদিন লেনিনের পিতৃবিয়োগ ঘটে তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো বছর। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একদিন সংবাদ এলো যে তাঁর বিদ্রোহী ভ্রাতা আলেকজাণ্ডারের আরও চারজন বিদ্রোহীর সঙ্গে ফাঁসির হুকুম হয়েছে! তাদের অপরাধ, তারা রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে গোপনে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেছে।

রাজদ্রোহী ভ্রাতা যেদিন ফাঁসির মঞ্চে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন সেদিন লেনিনের চোখে জল ছিল না। সেদিন তিনি উপলব্ধি করলেন প্রায় শতাব্দী কাল ধ'রে এমনি ক'রে কত স্নেহময় ভ্রাতা প্রাণ দিয়েছে, তাঁর মায়ের মতো কত মায়ের বুক থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে এনে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের সকলের ঐ একমাত্র অপরাধ—তারা অত্যাচারীর ধ্বংস কামনা করেছে—রাশিয়াকে মুক্ত করতে চেয়েছে, দেশকে ভালোবেসেছে!

কিন্তু কে এর প্রতিশোধ নেবে? কে বাঁচাবে রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ প্রাণ? দাদার কাছে তিনি শুনেছিলেন যে গ্রামে গ্রামে লোকে না খেয়ে মরছে। নিজে তিনি দেখেছেন লোকে অনাহারে অর্দ্ধাশনে রোগভার-জর্জ্জরিত দেহে কোনরকমে বেঁচে আছে শুধু মরণের প্রতীক্ষায়, ছোট ছোট শিশুগুলি অনাহারে মুমূর্ষু, তাদের কণ্ঠস্বর

বিকৃত, চক্ষু কোটরগত। শিক্ষা তো দূরের কথা, তাদের দু'বেলা অন্ন দেবার কেউ নেই। রাশিয়ার ঘরে ঘরে শুধু এই দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যু।

এদিকে রাজধানীতে থাকেন রাশিয়ার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা জার দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডার; তাঁর ভোগ-বিলাস ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না। তাঁকে ঘিরে থাকে অর্থলোলুপ পারিষদ্‌বর্গ। রাজপুরুষেরা প্রজাদের রক্ত শোষণ করে, কথায় কথায় তাদের প্রাণান্ত ঘটায় আর রাজধানীতে এসে জারের মনোরঞ্জন করে নীচ চাটুকারিতা দিয়ে। প্রজারা উপবাস করে আর জারকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। কে এদের জাগিয়ে তুলবে?

কৃষক আর মজুর অর্থাৎ যারা মাটি চাষ ক'রে শস্য উৎপাদন করে আর যারা কারখানায় হাডভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে কল চালিয়ে পণ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করে, এই দুই শ্রেণীর লোক নিয়েই রুশ-জাতি গঠিত। এরাই রাশিয়ার প্রজাসাধারণ। এদের পরিশ্রমেই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, জারের ঐশ্বর্য্য-আডম্বর—এরাই জাতির প্রাণশক্তির উৎস; অথচ এরাই সকলের চেয়ে বেশি কষ্টভোগ করে। প্রজারা খাজনা দেয়, নানাবিধ কর দেয়, অথচ তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এমন কি দু-মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করতেও শাসকরা কোনদিন চেষ্টা করেন না। তারা পরিশ্রম করে আর নীরবে অনাহারে মৃত্যুবরণ করে—এমনই রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা।

জারের রাজত্বে এমন ব্যাপার যে, শুধু কতকগুলি লোকই ধনী হয়। তারাই জারের চারপাশে থাকে আর প্রজাদের শোষণ করে, তাদের নিয়েই রাশিয়ার অভিজাতসম্প্রদায়, তাদের অত্যাচারেই লক্ষ লক্ষ প্রজা শতাব্দীর পর শতাব্দী শুধু চোখের জল ফেলেছে।

তারপর তারা সমবেত হয়ে সেই শাসন-ব্যবস্থার প্রতিবাদ করলে। বড় বড় মনীষীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা মানুষ হিসেবে বাঁচবার অধিকার দাবী করলে, কিন্তু শাসকবর্গ সে প্রতিবাদ গ্রাহ্যই করলেন না। তখন অনেকে প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে গোপনে সশস্ত্র বিদ্রোহ করবার চেষ্টা করতে লাগলো। এদেরই নিহিলিস্ট বা ধ্বংসবাদী বলা হয়। কিন্তু শাসনকর্ত্তারা সমস্তই খবর রাখতেন। যাকেই সন্দেহ হ'ত, তাকে হয় কঠোর কারাদণ্ড, নয় সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন, নয় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ত। নির্য্যাতন যত বাড়তে থাকে, অত্যাচার যত দুঃসহ হয়, দেশের লোক ততই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।' এমনি ক'রে প্রায় শতাব্দীকাল ধ'রে বিদ্রোহীর সংখ্যা বেড়ে গেল আর জারের অত্যাচার নির্ম্মম হয়ে উঠলো। তখন উপবাসী মুমূর্ষু-রাশিয়ার প্রজাদের শুধু একমাত্র চিন্তা কেমন ক'রে এই শাসকদের উচ্ছেদ ক'রে নূতন শাসনব্যবস্থা আনা যায়; কেমন ক'রে এক নূতন রাষ্ট্র গ'ড়ে তোলা যায়, যেখানে প্রত্যেক লোকটি ক্ষুধার অন্ন পায়, পায় শিক্ষা, পায় স্বাস্থ্য, পায় মানুষ হয়ে বেঁচে থাক্‌বার অধিকার—এই হ'ল সমগ্র রাশিয়ার কৃষক আর শ্রমিকদের একমাত্র চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা।

মাত্র সতেরো বছর বয়সে শোকাতুরা জননীর পাশে ব'সে লেনিন প্রথম উপলব্ধি করলেন যে, তাঁকেই রাশিয়ার দুঃখমোচন করতে হবে, অত্যাচারীর উচ্ছেদসাধন করতে হবে, গ'ড়ে তুল্‌তে হবে নতুন রাষ্ট্র, অভিনব সমাজ!

সিম্‌বারস্‌ক্‌এর স্কুল থেকে পাশ ক'রে তিনি "কাজান" বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এলেন। এখানে এসে তিনি দেখলেন যে তাঁর

দাদার প্রাণদণ্ডের পর থেকে তিনি যে সমস্ত কথা ভাবছেন এখানকার ছাত্ররাও সেই সব কথা চিন্তা করে এবং আলোচনা করে। এখানকার ছাত্ররা তাঁরই মতো ভাবছে কেমন ক'রে জারের শাসনতন্ত্র ধ্বংস ক'রে নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়।

কয়েক দিনের মধ্যেই লেনিন তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, তাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে লাগলেন। ক্লাস ছুটি হয়ে যাওয়ার পর গোপনে তাঁদের বৈঠক বস্‌তো। সকলেরই বয়স অল্প এবং সকলেই হঠাৎ কিছু একটা ক'রে ফেল্‌তে চায়। তাদের সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠে' বলে, যদি বিপ্লব করতেই হয় তাহ'লে এখনি উপযুক্ত সময়। ভেবে-চিন্তে ফলাফল দেখতে গেলে চলবে না—বিপ্লব এমন হওয়া চাই যাতে শাসকগণ হঠাৎ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়!—এ সমস্তই অপরিণত বয়সের উত্তেজনা মাত্র। লেনিন দেখলেন যে, হঠাৎ কিছু একটা করলে অর্থাৎ জারের কয়েকটা লোককে হত্যা করলে ব্যাপারটা খুব চমকপ্রদ এবং আকস্মিক হবে বটে কিন্তু তার দ্বারা দেশের এই দুর্দ্দশা এই দুর্ভিক্ষ দূর করা যাবে না। সেই অল্প বয়সেই লেনিন পরিণাম চিন্তা ক'রে কাজ করতে শিখেছিলেন—তিনি বুঝেছিলেন যে, রাশিয়ার মুক্তি সাধন করতে গেলে অভিনিবিষ্ট চিন্তার প্রয়োজন, বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন; কিন্তু কী সে আয়োজন, কোন্ পথে বিপ্লবকে সার্থক করতে হবে, অনেক ভেবেও যুবক লেনিন এর সঠিক উত্তর পেতেন না। তাঁর সহপাঠীরা যখন উত্তেজনার বশে বিপ্লবের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইতো তখন তিনি তাদের সংযত হয়ে স্থির হয়ে চিন্তা করতে বলতেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তারা তাঁর কথা শুনতো আর তিনি নানা সমস্যার বিষয় আলোচনা করতেন।

ওদিকে জারের গোয়েন্দারা অনুসন্ধান ক'রে জান্‌তে পারলে যে, সিম্‌বারস্‌ক্ থেকে গম্ভীর প্রকৃতির যে ছেলেটি এসেছে তার চেহারায় যেন কী একটা আছে, তার কথায় জাদু আছে। ছেলের দল তার কথায় ওঠে বসে, তারা গোপনে আলোচনা করে কেমন ক'রে জারের রাজত্ব ধ্বংস করা যায়। এ তো বড় ভয়ানক কথা! যথাসময়ে কর্ত্তৃপক্ষের নজর পড়লো এই গম্ভীর যুবকটির উপর—কয়েকদিনের মধ্যেই লেনিনকে কারারুদ্ধ করা হ'ল। রাজদ্রোহের অপরাধে এক দূর গ্রামে তাঁর দুই বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন হ'ল।

এই দুই বছর নির্ব্বাসন হওয়ায় লেনিন জ্ঞানান্বেষণের সুযোগ পেলেন। জনহীন সুদূর গ্রামে ব'সে তিনি কার্ল্ মার্কস্‌এর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' বইখানির সঙ্গে পরিচিত হ'লেন। কার্ল্ মার্কস্ ঐ বইখানিতে অনেক বিচার-বিতর্ক ক'রে প্রমাণ করেছেন যে, যেদিন পৃথিবীর কৃষক আর শ্রমিক দলবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করবে এক নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, সেইদিন জগতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হবে—মানুষ বিনা শ্রমে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হতে পারবে না, বহুলোকের রক্ত জল করা অর্থে কতকগুলি লোকের ভোগলালসা চরিতার্থ হবে না—এই পৃথিবীর মাটি, খনি আর কারখানা, যা' কিছু থেকে মানুষ অর্থ উপার্জ্জন করে দৈহিক পরিশ্রম দিয়ে, সে সমস্ত কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হবে না—সকলের শ্রমলব্ধ অর্থ যোগ্যতা অনুসারে সকল মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় করা হবে। যেদিন এই ব্যবস্থা সম্ভব হবে, সেদিন মানুষের সঙ্গে মানুষের এই শত্রুতা, এই জিঘাংসার অবসান হবে—জগতে সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে—পৃথিবীতে একটিমাত্র শ্রেণীবিহীন সমাজ থাকবে, সে সমাজ মানুষের!

কার্ল মার্কস্ পড়তে পড়তে তাঁর বিস্ময়ের আনন্দের আর অবধি রইল না। এই তো তিনি পথ খুঁজে পেয়েছেন! এতদিন তিনি দিশাহারা হয়ে যে পথ খুঁজে বেড়িয়েছেন এই মনীষী তো তারই নির্দ্দেশ দিয়েছেন তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে! যে-নূতন রাষ্ট্র তিনি গ'ড়ে তুল্‌বেন তার স্বরূপ যে এই বইখানির প্রতিছত্রে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে! ক্যাপিটাল গ্রন্থের মধ্যে লেনিন যেন ডুবে গেলেন। তাঁর উদ্বেলিত হৃদয়কে শান্ত ক'রে তিনি তখনই ভাবতে লাগলেন কেমন ক'রে মার্কস্‌এর এই নীতি রাশিয়ায় প্রচার করা যায়, কেমন ক'রে এই আদর্শ সফল হয়ে উঠবে। তিনি জান্‌তেন যে, সমগ্র রুশ-সাম্রাজ্য-ব্যাপী বিদ্রোহের জন্য উত্তেজনার চেয়ে বেশি প্রয়োজন বিচারবুদ্ধি আর অধ্যয়ন, আলোচনার চেয়ে বেশি প্রয়োজন কর্ম্মতৎপরতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের দলবদ্ধ করা। এবং সকলের বড় প্রয়োজন—প্রথমে জান্‌তে হবে বিপ্লবের আয়োজনে কী তাঁদের অভাব এবং কেমন ক'রে সে অভাব দূর ক'রে তাঁরা তাঁদের বিপ্লবকে সার্থক ক'রে তুল্‌তে পারবেন।

এইসব চিন্তার মধ্য দিয়ে দেখতে দেখতে তাঁর নির্ব্বাসনকাল শেষ হয়ে গেল।

নির্ব্বাসন থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি সেন্ট্‌ পিটারস্‌বার্গ থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লেন কিন্তু ওকালতি করা আর তাঁর হয়ে উঠলো না। সেন্ট্‌ পিটারস্‌বার্গ সহরে ব'সেই তিনি রীতিমত গবেষণা শুরু ক'রলেন। প্রাচীন ও নূতন নথিপত্র ঘেঁটে অশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি শ্রমিক আর কৃষকদের সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। এইটিই ছিল তাঁর অসাধারণত্ব—পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই একমাত্র বিপ্লবী যিনি বিপ্লবটাকে একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার মতো

গবেষণা এবং চিন্তার বিষয় ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মনে কোথাও কোন উত্তেজনা ছিল না, স্থিরবুদ্ধি ও মনস্বী চিন্তাবীরের মতো তিনি একটি একটি ক'রে বিপ্লবের সমস্ত দিক, সর্ব্ববিধ সমস্যা আলোচনা ক'রে দেখতে লাগলেন। এতখানি চিত্তসংযম ও আত্ম-বিশ্বাস ছিল ব'লেই তিনি একা একটা বিশাল জাতির প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

হঠাৎ যদি তিনি বিদ্রোহ করতেন তাহ'লে সেদিন তাঁর সহকর্ম্মীর অভাব হ'ত না, কিন্তু জারের শক্তির কাছে সে বিপ্লব নিমেষে পরাভূত হ'ত—রাশিয়ার সৌভাগ্য-রবি আবার মেঘাবৃত হ'ত।

কিছুদিন পরে লেনিন পুঁথিগত অভিজ্ঞতা শেষ ক'রে ব্যক্তিগত এবং বাস্তব শিক্ষা-লাভে মন দিলেন। সেণ্ট্ পিটারস্‌বার্গ সহরে তিনি কারখানায় কারখানায় ঘুরে কুলি-মজুরদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে তাদের মুখ থেকেই তাদের দৈন্য, তাদের দুরবস্থার কথা শুনতে লাগলেন এবং ঠিক করতে লাগলেন কেমন ক'রে, কী ভাষায় কথা বললে এই অশিক্ষিত মজুরদের জাগিয়ে তোলা যাবে, তাদের বোঝানো যাবে তাদেরই দুর্দ্দশার কথা। লেনিন এত সহজ ভাষায় বলতে ও লিখতে পারতেন যে, নিতান্ত অশিক্ষিত লোকেরও তাঁর কথা বুঝতে কষ্ট হ'ত না। এইজন্য তাঁর লেখায় কোন সাহিত্যিক ভাষা-চাতুর্য্য নেই, আছে শুধু তাঁর বক্তব্য বিষয় আর যুক্তি।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও লেনিন মার্কস্‌বাদ প্রচার করতে লাগলেন। সকলের সঙ্গে মেশবার অদ্ভুত শক্তি ছিল তাঁর; মজুরদের তিনি আপনার লোক আবার শিক্ষিত যুবকদের তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু! যেখানেই যুবকের দল জড়ো হয় সেখানেই লেনিন তাঁর আদর্শের কথা প্রচার ক'রে বেড়ান। ক্রমশ তিনি ছাত্র, কৃষক আর মজুরদের মধ্যে

বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। তাঁর নেতৃত্বে একটি গোপনচারী দল গ'ড়ে উঠলো। এমন কি গোপনে তাঁরা তাঁদের মতবাদ প্রচার করবার জন্য একখানা খবরের কাগজও ছাপতে লাগলেন এবং গোপনে তার প্রচারও হ'তে লাগলো।

কিন্তু লেনিন দেখলেন যে পুলিশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হ'লে একটা নূতন পথ আবিষ্কার করতে হবে। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি বৈজ্ঞানিক হয়ে গেলেন—অনেক চেষ্টার ফলে একপ্রকার কালি তৈরী করলেন যাতে লিখলে দেখা যায় না। গবেষণা ক'রে তাঁর দলের মধ্যে কাজ চালাবার জন্য একরকম সাঙ্কেতিক ভাষার সৃষ্টি করলেন এবং সহর ও তার আশেপাশে কোথায় কী আছে, সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ ক'রে ভবিষ্যৎ যাতায়াতের পথ ঠিক ক'রে ফেল্‌লেন।

এই সময় থেকে লেনিনের যে কর্ম্মজীবন শুরু হ'ল তার মধ্যে কোথাও কোন অবকাশ রইল না। নিজের দিকে ফিরে তাকাবার, নিজের সুখ-শান্তির চিন্তা করবার কথা তিনি ভুলে গেলেন। কোনদিন কিছু খেতেন কোনদিন তা'ও হয়ে উঠতো না, আর পরনে ছেঁড়া পোষাক—এই ছিল তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অবস্থা। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এর পরিবর্ত্তন হয়নি।

সেণ্ট্ পিটারস্‌বার্গ সহরে যত শ্রমিক আছে তাদের মধ্যে লেনিন প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর উদ্দেশ্য হ'ল সহরের সমস্ত কুলি, তাঁতি, কারিগর এবং অন্যান্য শ্রমিক একসঙ্গে ধর্ম্মঘট করবে। তিনি প্রচার করতে লাগলেন শ্রমিকদের দাবী জানানোর একমাত্র উপায় সমবেত ধর্ম্মঘট, আবেদন-নিবেদনে কোন ফল কোনদিন হয়নি এবং হবেও না। তাঁর কথায় এত যুক্তি এবং প্রমাণ ছিল যে দেখতে দেখতে শ্রমিকরা তাঁর কথা শুনতে লাগলো—ধর্ম্মঘট দেখা দিল।

ক্রমশ ধর্ম্মঘট আরও ব্যাপক, আরও সঙ্ঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত হ'ল। কয়েকটা কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। লেনিন ছোট ছোট পুস্তিকা লিখে অতি সঙ্গোপনে সেগুলি শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করতে লাগলেন। ধর্ম্মঘট বন্যার মত সেন্ট্ পিটারস্‌বার্গ সহর ছাড়িয়ে অন্যান্য সহরেও ছড়িয়ে পড়লো।

গবর্ণমেণ্ট তৎপর হয়ে উঠলেন। জার বিরক্ত হয়ে পুলিশের কর্ম্মচারীদের ধমক দিলেন। পুলিশের লোকেরা খানাতল্লাসী শুরু করলে শ্রমিকদের পাড়ায় পাড়ায়। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে, যে সমস্ত বই প'ড়ে উত্তেজিত হয়ে শ্রমিকরা ধর্ম্মঘটে যোগদান করছে সেগুলি লেনিন-নামধারী এক বিপ্লববাদীর লেখা—সেই লোকটিই সকল অনর্থের মূল।

ফলে ১৮৯৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে লেনিনের কারাদণ্ড হ'ল। কিন্তু লেনিনের চাতুর্য্যের সঙ্গে পুলিশ পেরে উঠবে কেন? জেলের মধ্যে থেকেও বাইরের লোকের সঙ্গে কেমন ক'রে সংযোগ রাখা যায়, কেমন ক'রে বিপ্লবীদলকে পরিচালিত করা যায়, সমস্তই লেনিন বহুপূর্ব্বে ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। কাজেই জেলের মধ্যে ব'সেই লেনিন বিপ্লবীদের নেতৃত্ব করতে লাগ্‌লেন। গবর্ণমেণ্ট বিপ্লবীদের সর্দ্দারকে ধ'রে রেখে পরম স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। এদিকে জেলে ব'সে লেনিন দলের লোকের সঙ্গে গোপনে সকল কথাবার্ত্তাই চালাতে লাগলেন—কোথাও কোন অসুবিধা হ'ল না।

দ্বিতীয় নিকোলাসের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষ্যে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া মাত্রই তিনি কাজে লেগে গেলেন। যাতে সমগ্র রাশিয়ার শ্রমিকরা একসঙ্গে ধর্ম্মঘট করে এবং তাদের নিয়ে একটা বিরাট সঙ্ঘ বা দল গ'ড়ে তোলা যায়—এবার জেল থেকে বেরিয়ে লেনিন

সর্ব্বপ্রথম সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন। গবর্ণমেন্ট প্রথমে গ্রাহ্য করেননি, কিন্তু তারপর যখন দেখা গেল লেনিনের চেষ্টা ধীরে ধীরে সাফল্যলাভ করছে তখন তাঁরা রীতিমত ভীত হয়ে পড়লেন। লেনিনকে তিন বৎসরের জন্য সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত করা হ'ল।

সাইবেরিয়া পৃথিবীর মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর স্থান। সেই তুহিনাচ্ছন্ন জনমানবহীন ভীষণ নিঃসঙ্গতায় বহু নির্ব্বাসিত বন্দীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে, বহু হতভাগ্য যক্ষ্মারোগে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করে। সাইবেরিয়ার বন্দী-নিবাসে বাস করতে করতে একটা ভয়াবহ অবসাদ মানুষের সকল শক্তিকে পঙ্গু ক'রে দেয়—যারা ফিরে আসে তারা পঙ্গু, অভিশপ্ত, প্রাণহীন জড়ের মতো ফিরে আসে। লেনিন এ সমস্তই জানতেন তাই ঐ ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী নির্জ্জনতার অবসাদ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য তিনি অন্তরের সমস্ত শক্তিকে সংহত ক'রে, দেহে মনে ঈশ্বর তাঁকে যে শক্তি দিয়েছিলেন সেই শক্তিকে জাগিয়ে রাখলেন তাঁর চিন্তার মধ্যে—তাঁর আত্মচেতনা অব্যাহত রইল তাঁর স্বপ্নের মধ্যে। সেইখানে ব'সেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার একটা পাকাপাকি খসড়া তৈরী ক'রে ফেললেন।

ঐ খসড়াতে লেনিন স্থির করেন যে তাঁরা একান্ত অন্তরঙ্গ কয়েকজন কর্ম্মী মিলিত হয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠন করবেন। ঐ দলের প্রচারকার্য্য চালাতে হবে একখানি কাগজের মারফৎ, সে কাগজখানিও ঐ দলের দ্বারাই পরিচালিত এবং প্রচারিত হবে। রাশিয়ার প্রত্যেক সহরে ঐ দলের মতো এক একটা দল গঠন করতে হবে—তাদের বলা হবে "সোভিয়েট"। এই সোভিয়েটগুলি প্রধান দলের অনুবর্ত্তী এবং আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে এবং প্রধান দলের ঐ সংবাদপত্রটির মারফৎ এরা প্রধানদলের কর্ম্মসূচী এবং নীতি অবগত

হবে। কিন্তু প্রধান দলের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হবে পুলিশের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা। কেননা শতাব্দীকাল ধ'রে বিপ্লবীরা অনেক চেষ্টাই করেছে কিন্তু পুলিশের বাধাদানের ফলে সে সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেছে। পুলিশের অত্যাচারেই আজ পর্য্যন্ত কোন দল শক্তিশালী হয়ে গ'ড়ে উঠতে পারেনি, তাদের দলের সংবাদপত্রও তিন চার সংখ্যার বেশি প্রকাশিত হ'ত না। তিন বৎসর কাল একটি একটি ক'রে সমস্যা চিন্তা ক'রে লেনিন এক অভিনব কর্ম্মপদ্ধতি আবিষ্কার করলেন।

লেনিন স্থির করলেন যে পুলিশের দৃষ্টির বাইরে থাকতে হ'লে প্রধান দলকে রাশিয়ার বাইরে থাক্‌তে হবে। সেইখান থেকে কাগজ ছাপিয়ে রাশিয়ায় পাঠাতে হবে। কিন্তু এমন ভাবে সে কাগজ রাশিয়ায় প্রচার করতে হবে যাতে সে কাগজ পুলিশের হাতে পড়লেও তারা বুঝতে পারবে না যে, সে কাগজ রাশিয়ার বাইরে ছাপা হয়। এই কাগজের প্রচার এবং ঐ প্রধান দলের সঙ্গে শাখা-দলগুলির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য রাখার জন্য কোন্ গোপন পথে রাশিয়ায় প্রবেশ করা সকলের চেয়ে নির্ব্বিঘ্ন তা' পর্য্যন্ত লেনিন স্থির ক'রে রাখলেন। এ ছাড়া নূতন সাঙ্কেতিক ভাষা প্রভৃতি অনেক কিছুই লেনিন ঠিক ক'রে রেখে মুক্তির দিন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তিন বৎসর পর ১৯০০ সালের মার্চ্চ মাসে যেদিন তিনি সাইবেরিয়া থেকে রাশিয়ার পথে যাত্রা করলেন সেদিন তাঁর মনে ভবিষ্যৎ মহাবিপ্লবের সমস্ত আয়োজনের পথ এবং পদ্ধতি প্রস্তুত। সেদিন লেনিনের দৃষ্টিতে রুদ্রের তেজ, অন্তরে সমগ্র রাশিয়ার সমবেত ক্ষুধানল!

সাইবেরিয়া থেকে সেণ্ট্‌পিটারস্‌বার্গ আসবার পথে স্কোভ্ নগরে লেনিন এক সভার আয়োজন করলেন; উদ্দেশ্য, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করা। এই সভায় লেনিন তাঁর কর্ম্মপদ্ধতির

খসড়াটির ব্যাখ্যা ক'রে দেন এবং এই সভাতেই স্থির হয় যে, তাঁদের কাগজের নাম হবে "ইস্ক্রা" অর্থাৎ "স্ফুলিঙ্গ", এবং লেনিন রাশিয়া ত্যাগ ক'রে চলে যাবেন। রাশিয়া ত্যাগ করার আয়োজনের জন্য লেনিন সেণ্ট্ পিটারস্‌বার্গ সহরে এসে উপস্থিত হ'লেন। কিন্তু স্টেশনে নাম্‌তেই পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেফতার করলে। তাঁকে এক সপ্তাহ হাজতে রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হ'ল; কেননা পুলিশ তাঁর কাছ থেকে কতকগুলি সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছুই পেলে না। ঐ কাগজগুলিতে শুধু বাজার খরচের হিসেব লেখা। বেচারা পুলিশ-কর্ম্মচারীটি জান্‌তো না যে ঐ কাগজগুলিতেই অদৃশ্য কালিতে "জার-তন্ত্র-বিধ্বংসী" দলের গঠনপ্রণালী এবং নীতি লিপিবদ্ধ ছিল।

এর কয়েকদিন পরে একটা পাস্‌পোর্ট জাল ক'রে তারই সাহায্যে লেনিন রাশিয়া ত্যাগ ক'রে মিউনিক সহরে চ'লে আসেন এবং "ইস্ক্রা" কাগজের প্রথম সংখ্যা বার করেন

এইবার তিনি অতি দ্রুত তাঁর আদর্শের পথে কাজ ক'রে যেতে লাগলেন। মিউনিক থেকে তিনি লণ্ডনে আসেন এবং সেইখানে ব'সেই তিনি তাঁর সমস্ত বিখ্যাত বইগুলি লিখতে শুরু করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর গুরু কার্ল মাক্‌স্-ও নির্ব্বাসিত অবস্থায় লণ্ডনে ব'সেই তাঁর বিখ্যাত বই "ক্যাপিটাল" রচনা করেন।

লণ্ডনে এসে তাঁর কাজের কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। তিনি এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা করেন যাতে বিদেশে থেকেও তিনি দিনের পর দিন রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব করতে থাকেন। লণ্ডনে ব'সে তিনি সব সময় রাশিয়ার খবর পেতেন এবং তাঁর সেই অদৃশ্য কালিতে লিখিত আদেশ রাশিয়ায় পাঠিয়ে দিতেন। আর সেখানে তাঁর আদেশ মতো বিপ্লবীরা কাজ ক'রে যেতো। এই লণ্ডনেই তাঁর

আমরণ-সহকর্ম্মী বিশ্ব-বিখ্যাত লিয়ঁ ট্রট্‌স্‌কি সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে তাঁর সঙ্গে এসে যোগদান করেন।

এই সময় ১৯০৩ সালে লেনিন ও তাঁর অন্যান্য নির্ব্বাসিত সহ-কর্ম্মীরা মিলে লণ্ডনে এক জরুরী বৈঠকের আয়োজন করেন। সভায় লেনিন ও তাঁর সহকর্ম্মীদের মধ্যে দলের সদস্য হওয়া সম্বন্ধে মত-বিরোধ হয়। একদল বললেন যে, যে কেউ তাঁদের দলের (Russian Socialistic Democratic Party) কার্য্যাবলীর সমর্থন করেন বা অর্থদ্বারা সাহায্য করেন কিংবা কার্য্যত সহযোগিতা করেন তিনিই দলের সদস্য ব'লে গৃহীত হবেন। দ্বিতীয় দলের মত হ'ল যে, একমাত্র যে লোক কার্য্যত সহযোগিতা করবেন তিনি সদস্য বিবেচিত হবেন। প্রথম দলের নেতা ছিলেন মার্ত্তভ্‌ এবং দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন লেনিন। সভায় লেনিনের পক্ষে ভোট হয় ২৫টি এবং মার্ত্তভের ২৩টি। রুশ ভাষায় সংখ্যা-লঘু দলের নাম Mensheviki আর সংখ্যা-গুরু দলের নাম Bolsheviki। সেই থেকে লেনিনের দলের নাম হল বোলশেভিকী, এবং লেনিনের দলই রাশিয়াতে কম্যুনিস্‌ম্‌ বা সাম্যবাদ্‌-এর প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় ব'লে বোলশেভিস্‌ম্‌ এবং কম্যুনিস্‌ম্‌ একার্থবোধক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে লেনিনের বোলশেভিস্‌ম্‌-এর রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হ'ল কম্যুনিস্‌ম্‌ বা সাম্যবাদ।

লণ্ডন থেকে যখন লেনিন প্রচারকার্য্য চালাচ্ছিলেন তখন রাশিয়ার জারের অত্যাচার চরমে এসে পৌঁছল। একদিকে জারের অত্যাচার, রাজপুরুষদের অমানুষিক ব্যবহার, অন্যদিকে অভিজাত সম্প্রদায় ও ধনিক-সম্প্রদায়ের নির্ম্মম উদাসীনতায় জনসাধারণের জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠলো। তবু তখনও তারা জারকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতো, জারের কাছে তারা দয়া ভিক্ষা করতো, জারের উচ্ছেদ তারা

সেদিনও কামনা করেনি। কিন্তু সহসা একটি ঘটনায় জারের পাশবিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেয়ে সমগ্র রাশিয়ার জনসাধারণের মন থেকে জারের প্রতি ভক্তি চ'লে গেল, তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

১৯০৫ সালের ২২শে জানুয়ারী ফাদার গাফুন নামে এক সাম্যবাদী কর্ম্মীর নেতৃত্বে দু'লক্ষ আশি হাজার শ্রমিক সমবেত হয়ে জারের কাছে সাক্ষাৎভাবে তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা তাদের অন্তরের ক্ষোভ নিবেদন করবে ব'লে শোভাযাত্রা ক'রে প্রাসাদের অভিমুখে যেতে থাকে। সহসা জার আদেশ দিলেন, "গুলি চালাও!" সেই নিরস্ত্র বিপুল জনতার ওপর গুলি বর্ষণ শুরু হ'ল, শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং জারের সৈনিকরা সেই বিমূঢ়, বিক্ষিপ্ত জনতার মাঝে যে নির্ম্মম অত্যাচার এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকে তারই মধ্য থেকে সমগ্র রাশিয়াব্যাপী বিদ্বেষবহ্নি জ্ব'লে ওঠে।

লণ্ডনে ব'সে এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে লেনিন আরও গভীর ভাবে, তীব্রতর ভাষায় এবং যুক্তির সাহায্যে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাতে লাগলেন। সেই বছরই শ্রমিকরা সমবেত হয়ে জার-গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। কিন্তু সে বিদ্রোহ সফল হ'ল না—সে-উত্থান অল্পেই ব্যর্থ হয়ে গেল। দলের অনেকে এই ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে পড়লেন, কিন্তু লেনিন হতাশায় সময় ব্যয় না ক'রে বিচার ক'রে দেখতে লাগলেন কেন এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হ'ল, কী কারণে এই জাগরণ সফল হ'ল না। যাতে কোথাও কোন ত্রুটি কোন দুর্ব্বলতা না থাকে সেইভাবে কঠোর ব্যবস্থা করবার জন্য তিনি ছদ্মবেশে রাশিয়ায় ফিরে এলেন। কিন্তু পুলিশ তখন তাঁকে গ্রেফতার করবার জন্য সারা রাশিয়া তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাঁরই জন্য নাকি জারের সুনিদ্রা হয় না। কাজেই লেনিন রাশিয়া থেকে পুনরায়

পালিয়ে ফিনল্যাণ্ডের কাউকাল্লা নামে এক গ্রামে এসে ছদ্মবেশে আশ্রয় নিলেন। এই গ্রামটি রাশিয়ার সীমান্ত থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে।

১৯০৫ সালের বিদ্রোহের ব্যর্থতার মূল কারণটা ছিল সামরিক। বিপ্লবীরা কেউই যুদ্ধের কিছু জানতো না—তারা নিতান্তই নিরস্ত্র সৈনিকমাত্র, অর্থাৎ তারা শুধু মরতেই জানে কিন্তু কেমন ক'রে তাদের মৃত্যুর দ্বারা বিদ্রোহ সফল হবে তা' তারা জানতো না। লেনিন ঠিক করলেন, আগামী বিপ্লবে যারা নেতৃত্ব করবে তারা শুধু দলপতি হবে না, তাদের সমর-শিক্ষা দিয়ে সেনাপতি ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে। ফিনল্যাণ্ডে ব'সে লেনিন তাদের এই সমর-শিক্ষার ব্যবস্থাই করতে লাগলেন। কিন্তু ফিনল্যাণ্ডেও আর তাঁর থাকা নিরাপদ হ'ল না। তিনি ফিনল্যাণ্ড ত্যাগ ক'রে সুইযজারল্যাণ্ডে এসে আশ্রয় নিলেন। সুইযজারল্যাণ্ড থেকে তিনি সেণ্টপিটারস্‌বার্গ সহরের শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন আরও তীব্র ক'রে তুললেন, তাদের অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর প্রথম কাজ। সুইযজারল্যাণ্ডে থাকতে তাঁর আর-একটি উল্লেখযোগ্য কাজ তাঁর "প্রভ্‌দা" কাগজ। "প্রভ্‌দা" শব্দের অর্থ "সত্য"; তিনি এই নামে গোপনে আর একখানা কাগজ বার করলেন। এই কাগজের মধ্য দিয়েই রুশ-বিপ্লবের বীজ রাশিয়ার গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ছড়িয়ে পড়ে। এই কাগজখানি বোল্‌-শেভিকদের গর্ব্ব, তাদের বিজয়ের প্রথম নিদর্শন। সম্পাদকের পর সম্পাদক গ্রেফতার হয়েছেন কিন্তু "প্রভ্‌দা" একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি।

শ্রমিকদের মধ্যে কাজ যখন অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, যখন তারা সকলেই বুঝেছে যে, ধনীদের চক্রান্তের ফলেই তাদের দুর্গতি এত

মর্ম্মান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধের দাবাগ্নিশিখা ইয়োরোপের আকাশে লেলিহান হয়ে দেখা দিল। লেনিন দেখলেন, এই উপযুক্ত সময়। তাঁর উপদেশ মতো রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করা হ'তে লাগলো যে, এই যুদ্ধ বেধেছে শুধু একদল ধনিকের সঙ্গে আর একদল ধনিকের স্বার্থের সংঘাতে, এ যুদ্ধে জয় যে পক্ষেরই হবে সে জয় ধনীদের—এই যুদ্ধের ফলেই জগতের শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ সমূলে বিনষ্ট হবে। অতএব তাদের কর্ত্তব্য এ যুদ্ধের কোন ব্যাপারে যোগ না দেওয়া, গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য না করা। সাম্যবাদীদের এই প্রচার এত ব্যাপক হয়েছিল যে ইতালী, জার্ম্মানী এবং অষ্ট্রিয়াতেও গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ-পরিচালনায় প্রবল বাধা পেয়েছিলেন।

এদিকে রাশিয়ায় নিরবচ্ছিন্ন প্রচারকার্য্যের ফলে লোকের মনে সাম্যবাদী নীতি এবং আদর্শ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। লেনিন যখন এই সমস্ত কথা প্রচার করবার পরামর্শ দিলেন তখন শ্রমিকরা সত্যিই যুদ্ধ-বিরোধী হয়ে উঠলো। গবর্ণমেণ্ট ভয় দেখিয়েও কিছু করতে পারলেন না। জার এমন অবস্থায় এসে পড়লেন যে বৃহত্তর রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থের জন্য তাঁকে যুদ্ধে যোগদান করতেই হ'ল। এদিকে যুদ্ধ যতই চলতে থাকে রাশিয়ার দুর্দ্দশাও তত বাড়তে থাকে। দেখতে দেখতে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ, জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের পীড়নে হাহাকার তীব্র হয়ে উঠলো। শেষে দেশের অবস্থা এতই সঙ্কটাপন্ন হ'ল যে, এক টুক্‌রো রুটির অভাবে লোকে ঘরে ব'সে মরতে লাগলো। বহু শিশু অনাহারে প্রাণত্যাগ করলে; ঘরে ঘরে শুধু অনশন, হাহাকার আর মৃত্যু; গ্রামের পরে গ্রাম জনশূন্য হয়ে গেল। উপবাসী শ্রমিকের দল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো—তারা গবর্ণমেণ্টের ধ্বংস চায়। এবং এই ক্ষিপ্ত শ্রমিকদের সঙ্গে এসে যোগ দিলে ক্ষুব্ধ

সৈনিকের দল। গবর্ণমেণ্টের একমাত্র ভরসা ছিল তাঁদের সামরিক বাহিনী—এইবার তাও বুঝি হস্তচ্যুত হয়।

১৯১৭ সালে বোল্‌শেভিক্ দল ক্ষিপ্ত জনতাকে পিছনে নিয়ে বিপ্লব ঘোষণা করলে। তারা গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলো—জার বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য যে সৈন্য পাঠালেন তারাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলে। ভীষণ কৃতান্তের মতো বিপ্লব দেখা দিল—বুভুক্ষাপীড়িত, অত্যাচারিত সর্ব্বহারা শ্রমিকের দল হিংস্র পশুর মতো রাজধানীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তাদের তখন বিচার ক'রে দেখবার অবসর নেই, জঠরের ক্ষুধানল তাদের পাগল করেছে। ত্রস্ত, বিপন্ন জার সিংহাসন ত্যাগ ক'রে রাশিয়ার পূর্ব্বদিকে ককেশাস্ পর্ব্বতের দিকে পালিয়ে গেলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ক্ষুধিত জনতা সেইখানে গিয়ে জারবংশের উচ্ছেদ সাধন করলে। রাশিয়ার প্রবল-পরাক্রান্ত, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জারবংশের একটি শিশুও রক্ষা পেলে না।

এই বিপ্লব-উত্থানের সংবাদ পেয়েই লেনিন দেশে ফিরে এলেন। রাশিয়ার ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে, সেই ভীষণ সঙ্কট-মুহূর্ত্তে লেনিন বিপ্লবের নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন। সাক্ষাৎভাবে তিনি সেই ক্ষিপ্ত জনতাকে আপনার সুনিশ্চিত আদর্শের পথে পরিচালিত করতে লাগলেন। এই উত্তেজনা এবং কলরবের মধ্যে তিনি একমুহূর্ত্তও বোলশেভিক্ আদর্শের কথা বিস্মৃত হননি। এইবার তাঁরই হাতে জগতে নবযুগের সূচনা করবার দায়িত্ব—সাম্যবাদী রাষ্ট্র স্থাপন করতে হবে।

জার-বংশের উচ্ছেদ হওয়ার সংবাদ ইয়োরোপে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার শত্রুমিত্র—ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত দেশগুলির গবর্ণমেণ্ট—বিপ্লবীদের শত্রুতা করতে বদ্ধপরিকর হ'লেন, কেননা

সাম্যবাদ- নীতি তাঁদের সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতান্ত্রিকতার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সাম্যবাদীদ ের উত্থানে তাঁদেরও ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল, কাজেই লেনিনের অভ্যুদয়কে তাঁরা অশুভ ব'লেই মনে করলেন। এমন কি, একদিকে জার্ম্মানী এবং অন্যদিকে কৃষ্ণসাগরের তীরে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীদলের রুশ-সেনাবাহিনীর রীতিমত সংঘর্ষ বেধে গেল।

একদিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং অন্য দিকে রাশিয়ার ক্ষুধিত জনতার মাঝে প'ড়ে লেনিনের জীবন বিপন্ন হ'ল। রাশিয়ার সেদিনের সকলের বড় সমস্যা হ'ল কেমন ক'রে এই বিক্ষুব্ধ উদ্বেলিত জনসমুদ্রকে শান্ত রাখা যায়, কেমন ক'রে এদের মধ্য থেকেই বিভিন্ন সোভিয়েট ইউনিয়ন গ'ড়ে তুলে এক বিশাল রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

লেনিন জনতার মনস্তত্ত্বে পণ্ডিত ছিলেন, তিনি অসামান্য গঠনদক্ষতার বলে বিপ্লবীদলের গবর্ণমেণ্ট গ'ড়ে তুললেন। যে সকল বিপ্লবীদলের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির উপর কেন্দ্রীয় শাসনভার ন্যস্ত করা হ'ল তাঁদের আখ্যা দেওয়া হল, 'Council of People's Commissars' অর্থাৎ জনসাধারণের দায়িত্বশীল প্রতিনিধিদের বৈঠক। বিপ্লবী-গঠিত এই শাসন-পরিষদের বিভিন্ন শাখা ছিল, তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য 'Revolutionary Military Committee'—বিদ্রোহের বিরুদ্ধে দেশে যে সমস্ত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তাদের দমন করা এবং বিদেশী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে মার্কস্-বাদকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ঐ সমর-পরিষদের সৃষ্টি হয়েছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত শাসন-পরিষদ গঠনে যাঁরা লেনিনের সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ট্রট্স্কি বিশ্ব-বিশ্রুত।

লেনিন হ'লেন ঐ শাসন-পরিষদের প্রথম প্রতিনিধি অর্থাৎ তাঁকেই সর্ব্বোত্তম সচিব ব'লে ঘোষণা করা হ'ল—তাঁরই হাতে রইল চরম ব্যবস্থার ভার। ১৯১৭ সালের ৭ই নবেম্বর, যেদিন বোল্‌শেভিকরা রাশিয়ার শাসনভার গ্রহণ করে, সেইদিন থেকে মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিদারুণ অর্থাভাব, জাতীয় দুর্ব্বলতা, দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ এবং অনশন, গৃহযুদ্ধ এবং বিদেশীয় শক্রতা—সমস্ত কিছু বাধাকে অতিক্রম ক'রে অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে নিজের অসামান্য কর্ম্মশক্তির বলে বিপ্লবী, সাম্রাজ্যধ্বংসী লেনিন রাশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় রত ছিলেন। রুশ জাতিকে তিনি প্রাণবান্ করেছিলেন, প্রত্যেক রাশিয়াবাসীর জীবন তাঁর কাছে অমূল্য ছিল, সকলের সম্মিলিত সমৃদ্ধিই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। এতবড় একটা জাতির ভার যিনি বহন ক'রে চল্‌লেন, তাঁকে অর্দ্ধেক দিন অনশনে থাক্‌তে হ'ত, দুর্নিবার কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে প'ড়ে অনিদ্রায় তাঁর দীর্ঘদিন কেটে যেতো—ক্লান্তি কা'কে বলে তিনি জান্‌তেন না, আত্মসুখ ব'লে কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি।

দীর্ঘ কাল অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে একদিন টেবিলের উপর তাঁর মাথা ঝুঁকে পড়লো, সহসা তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে গেলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর দেখা গেল তাঁর সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। বিশ্রামের জন্য তাঁকে গর্কী নামে এক গ্রামে পাঠানো হ'ল। কিন্তু যে দুর্জ্জয় কাল-নিয়মে মানুষের দেহযন্ত্র চালিত হয় তার কাছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হ'ল। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী লেনিন তাঁর প্রিয় রাশিয়ার বুকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

লেনিনের মৃত্যুতে সারা দুনিয়ার শ্রমিক তাদের সকলের বড় দরদী বন্ধুকে হারালে। শ্রমিকদের যারা শত্রু তারা আজও জগতে

অপ্রতিহত, তাই লেনিনের জীবনের মূল্য তাদের কাছে অনেকখানি, লেনিনকেই ছিল তাদের একান্ত প্রয়োজন। রাশিয়ার শোকার্ত্ত সর্ব্বহারার দল নীরবে লেনিনের আত্মার শান্তি কামনা করলে।

লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য রাশিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাড সহরের নাম দেওয়া হ'ল লেনিনগ্রাড। সেই শহরে, যেখানে জারের প্রাসাদ ছিল তার সম্মুখে এক বিরাট স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হ'ল। সেই মন্দিরে তাঁর মস্তিষ্কটি সযত্নে সংরক্ষিত আছে—এই স্মৃতিমন্দিরটই বর্ত্তমান সোভিয়েট রাশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ।

লেনিনের মতবাদ যাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি তাঁরা লেনিনের চরিত্র সম্বন্ধে নানা কটূক্তি করেছেন বটে কিন্তু আমরা জানি পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় কর্ম্মবীর অত্যন্ত বিরল। এত অল্প সময়ের মধ্যে লেনিন একটা জাতিকে সম্পূর্ণ নূতন জীবন দান ক'রে গিয়েছেন যে তা' অনাগত যুগের ঐতিহাসিকদের কাছে অলৌকিক ব'লে মনে হবে। তিনি শুধু বিপ্লবের দ্বারা একটা সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন করেননি, তাঁর প্রতিভা এবং মনীষার বলে সমৃদ্ধতর এবং দৃঢতর ভিত্তির উপর একটা নতুন রাষ্ট্র গ'ড়ে তুলেছিলেন। লেনিন আজ আর পৃথিবীতে নেই কিন্তু তাঁর জীবনের সর্ব্বোত্তম আদর্শ জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, বর্ত্তমান রুশ-সাম্রাজ্য তাঁরই জীবনাদর্শের অনুলিপি মাত্র।

মধ্যযুগে একদিন দলে দলে লোকে সংসার ত্যাগ ক'রে তীর্থ-যাত্রা করতো জেরুসালেমের পথে, সর্ব্বমানবের শান্তিকামী ত্যাগী মহাত্মার স্মৃতিফলক স্বচক্ষে দেখবার জন্য; আজও তেমনি এশিয়ার পূর্ব্বপ্রান্ত থেকে দলে দলে লোকে মরুভূমির মধ্য দিয়ে, হিম-গিরি অতিক্রম ক'রে তীর্থযাত্রা করে—লেনিনগ্রাডের উদ্দেশে।

লেনিন ছিলেন আর্ত্ত, মূক, বঞ্চিতদের বন্ধু। তাদের আত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত,—তাঁর সে ব্রত সফল হোক্!

কেমাল আতাতুর্ক

বহুশতাব্দী ধ'রে মধ্য এশিয়ার গোবি মরুভূমির পশ্চিম সীমান্তে এক দুর্দ্ধর্ষ যাযাবর জাতি বাস করতো। তারা প্রাসাদ অট্টালিকার ধার ধারতো না। দীর্ঘদিন তারা তাঁবু ফেলে বসবাস করতো অনন্ত আকাশের তলে. জল আর বিশাল মরুপ্রান্তর ছিল তাদের লীলাভূমি। মেষপালন ছিল তাদের জাত-ব্যবসা আর হিংস্র পশুর প্রাণ সংহারে ছিল তাদের অপার আনন্দ। তাদের বাণিজ্য-পণ্য পশুর চর্ম্ম, শিল্প এবং চারুকলা তাদের কাছে আলস্য—শহর-বন্দরের প্রয়োজনও তাদের কোনদিন হয়নি।

কিন্তু একদিন মধ্য এশিয়ার উর্ব্বর ভূখণ্ড দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির ফলে শতধাদীর্ণ হ'য়ে গেল। মরুভূমি এগিয়ে এলো—মেষপালনের উপযোগী প্রান্তরগুলি তৃণগুল্ম-বিহীন মরুভূমিতে পরিণত হ'ল। জলাভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। যাযাবর জাতির সর্দ্দার তাঁবু উঠিয়ে চল্‌লো নূতন দেশের সন্ধানে, পিছনে সার বেঁধে চল্‌লো অসংখ্য যাযাবর নরনারী। পথে উত্তর দিক থেকে তাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু তাতার জাতি তাদের আক্রমণ করলে। অনশনক্লিষ্ট, মৃতপ্রায় নরনারীকে পথ দেখিয়ে তাদের সর্দ্দার দক্ষিণ দিকে চল্‌তে লাগলো। তারা বরাবর মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা করেছিল কাজেই দক্ষিণ দিকে চল্‌তেই তারা আর্ম্মেনিয়ার মধ্য দিয়ে এশিয়া মাইনরে

এসে উপস্থিত হ'ল। এই দেশটিই বর্ত্তমান তুরস্ক—সুসভ্য, স্বাধীন, পরাক্রমশালী তুরস্ক।

এইখানে এসে তারা ধীরে ধীরে রাজ্য গ'ড়ে তুল্‌লে। তাদের রাজা জয় করলে আরব এবং মিশর। দুর্ব্বল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য তাদের পদানত হ'ল। তারা চেয়ে দেখলে যে তাদের চারিদিকে শুধু কতকগুলো ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্য কোনরকমে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা এদের অস্তিত্ব লোপ ক'রে এক বিশাল সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুললে যার প্রতাপে খ্রীশ্চান সাম্রাজ্যগুলি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। তুরস্কের সম্রাটের কাছে নানা উপচার নিয়ে ইয়োরোপ থেকে দূত আস্‌তো—তুরস্কাধিপতি পৃথিবী জয় করবার জন্য ইয়োরোপের দিকে এগতে লাগ্‌লেন। এটা ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

কিন্তু এর পরেই এলো পতনের অধ্যায়। দেখতে দেখতে তিন শত বৎসরের মধ্যে তুর্কী সাম্রাজ্য দুর্ব্বল হয়ে পড়লো। ইয়োরোপের নরপতিরা তার অঙ্গচ্ছেদ ক'রে তাকে পঙ্গু করতে বদ্ধপরিকর হ'ল। মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুরস্কের দিন কাটলো শুধু ইয়োরোপের ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষা করতে। তুর্কী জাতির অবনতি চরম অবস্থায় এসে পৌঁছলো মহাযুদ্ধের সময়। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে তুরস্কের উপর কর্ত্তৃত্ব করতো জার্ম্মেনী, আর দেশের অভ্যন্তরে তারা মেনে চল্‌তো নানা কুসংস্কার। দেশের প্রতি কর্ত্তব্য তারা ভুলে গেল, ব্যক্তি হিসেবে তাদের কোন আত্মমর্য্যাদা ছিল না, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগেও তারা সেই মধ্যযুগের অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন ছিল। অশিক্ষা অস্বাস্থ্য জাতির মেরুদণ্ড দুর্ব্বল ক'রে দিলে।

কিন্তু মহাযুদ্ধের কোলাহল এবং বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে একটি ছেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জয়লাভ ক'রে হঠাৎ তুর্কী জাতির হৃদয় জয়

করলে। তারই পতাকাতলে তুর্কীরা এসে সমবেত হ'ল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই মধ্যযুগের সংস্কার পরিত্যাগ ক'রে তুর্কীরা ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সুসভ্য জাতিতে পরিণত হ'ল। এই বালকটির নাম মোস্তাফা। ইনি বর্ত্তমান জগতে কেমাল আতাতুর্ক নামে পরিচিত। আতাতুর্ক শব্দের অর্থ—তুর্কীদের পিতা।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইজিয়ান সাগরের উপকূলে সালোনিকা নামে একটি ছোট শহরে কেমাল আতাতুর্কের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন কাঠের ব্যবসায়ী এবং ছেলেকেও তিনি ব্যবসায়ী ক'রে তুলবেন এই সাধ ছিল। কিন্তু তার মায়ের ইচ্ছা ছিল যে কেমাল ধর্ম্মযাজক হবে, বিদ্বান হবে।

মোস্তাফার পিতৃবিয়োগ হয় অতি শৈশবে। স্বামিহীনা জুবেদা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভায়ের বাড়ি চ'লে এলেন। এখানে অনেক কষ্টে তাঁব এক ভগিনীর কাছ থেকে কিছু অর্থসাহায্য নিয়ে ছেলেকে স্কুলে দিলেন। কিন্তু মোস্তাফার স্কুল ভালো লাগলো না—মাস্টারদের সঙ্গে ঝগড়া হ'ল, ছেলেদের সঙ্গে মারপিট ক'রে স্কুলে অনর্থ বাধিয়ে মোস্তাফা বাড়ি ফিরেই বই শ্লেট ছুঁড়ে ফেলে দিলে। মা ছেলেকে শাসন করতে গেলেন। কিন্তু মামার বাড়িতে এসে মাঠে আর বনে ঘুরে বেড়িয়ে মোস্তাফার প্রকৃতিটা একেবারে বন্য হয়ে উঠেছিল। শাসনে কিছুই হ'ল না, বরং ছেলের জেদ বেড়ে গেল—স্কুলে আর সে কিছুতেই যাবে না।

অবশেষে তার মামা তাকে এক সৈনিকের স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন। এখানে মোস্তাফার আশ্চর্য্যরকম ভালো লাগলো। এখানে সে রীতিমতো ভালো ছেলে ব'লে খ্যাতি লাভ করলে।

সৈনিকদের স্কুলের শিক্ষকরা মোস্তাফাকে খুব স্নেহ করতে লাগলেন। এইখানেই অঙ্কের শিক্ষক সস্নেহে তাঁকে 'কেমাল' বলে ডাকতেন। তাঁর নাম ছিল কাপ্তেন মোস্তাফা, কাজেই নিজের নাম থেকে ছাত্রের নাম পৃথক ক'রে তার নাম দিলেন মোস্তাফা কেমাল।

মোস্তাফা স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে প্রবেশ করলে। ছোট বেলা থেকেই তার সৈনিক হবার দিকে ঝোঁক, তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে সে এক বিরাট সৈন্যদলের সেনাপতি হবে। সালোনিকায় একদল ছেলে জোগাড় ক'রে সকলে মিলে বিচিত্র বেশে মার্চ্চ করতে করতে রাস্তা দিয়ে যেতো, যেন যুদ্ধে যাচ্ছে। এইটিই ছিল মোস্তাফার শৈশবের একমাত্র খেলা। কৃত্রিম যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন খেলাই তার ভালো লাগতো না। এইজন্য সৈনিক হবার সুযোগ পেয়ে তার উৎসাহের আর শেষ নেই—কেবল যুদ্ধের বই পড়ে আর ছেলেদের কাছে বক্তৃতা করে। মা ভাবলেন, ছেলের এ আবার কি হ'ল ?

বাল্যকালটা কেমাল আতাতুর্কের এমনি ক'রে কৃত্রিম যুদ্ধায়োজন ক'রেই কেটে গেল।

মোস্তাফা কেমাল যখন কলেজে পড়তে এলেন, উদীয়মান তরুণ সৈনিকদের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব হয়ে গেল। এখন তাঁর আর সেই শৈশবের কলহপ্রিয়তা নেই, কলেজের বন্ধুদের তিনি পরিচালনা করেন আর তাদের সঙ্গে নানা সমস্যার কথা আলোচনা করেন।

এই সময় তুরস্কের সুলতান আব্দুল হামিদ অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অত্যাচারের কথা ছিল লোকের মুখে মুখে, অথচ সাহস ক'রে প্রকাশ্যে কেউ বিক্ষোভ প্রদর্শন করতো না। তার প্রধান কারণ ছিল তুর্কীরা তাদের সেই প্রাচীন সংস্কার অনুসারে

ইস্‌লাম ধর্ম্মের অনুশাসনের মতো নিষ্ঠার সঙ্গে রাজভক্তি প্রকাশ করতো।

এদিকে সুলতানও ওদের সেই সংস্কারের সুযোগ নিয়ে অবাধে স্বেচ্ছাচার ক'রে যেতে লাগলেন। তিনি জার্ম্মান-সম্রাটের পরামর্শে একাধিক ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ করতে লাগলেন আর নিরীহ ধর্ম্মভীরু প্রজাদের উপর জুলুম ক'রে গর্ব্ব অনুভব করলেন। একে ত স্বভাবতই তুর্কীরা সুলতানকে ভয় করতো, তার উপর শিক্ষিত তুর্কী যুবকরা পাছে সুলতানের কোন কাজের সামান্য প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করে তার জন্য সর্ব্বদা সুলতানের গোয়েন্দারা ঘুরে বেড়ায়। গোয়েন্দারা যাকে সন্দেহ করবে তার আর নিস্তার নেই। সুলতানের অত্যাচারের কথা ছেলেরা আলোচনা করে অত্যন্ত গোপনে, পাছে কেউ শুনতে পায়, পাছে সুলতানের কানে যায়। কে যে কখন ধরা পড়ে তার কিছুই ঠিক নেই। এই সব ব্যাপার দেখে কেমাল অবাক হয়ে যেতেন আর ভাবতেন কী করলে এর প্রতিকার করা যায়।

কেমালের সবচেয়ে প্রিয় পুস্তক ছিল ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস। রাত্রি জেগে তিনি গোপনে ফরাসী বিপ্লবের বিচিত্র রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়তেন। ফরাসী বিপ্লবের নেতা রোব্‌স্‌পিয়ের আর দান্‌তনের বক্তৃতা বার বার প'ড়ে তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। গভীর নিশীথে এই তুর্কী যুবকটি কল্পনায় সহপাঠী তুর্কী যুবকদের সুলতানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতেন। প্রত্যূষে যখন গাছে গাছে পাখী ডেকে উঠতো তখন কেমাল স্বপ্ন দেখতেন যে, তিনি এক বিশাল তুর্কী সেনাদলের পুরোভাগে থেকে সুলতানের প্রাসাদের দিকে সশস্ত্র শোভাযাত্রা ক'রে এগিয়ে চলেছেন শাসনতন্ত্র দখল করতে। আর

অম্‌নি প্রাত্যহিক কুচ্‌কাওয়াজ্‌এর ঘণ্টাধ্বনিতে তাঁর স্বপ্ন ভেঙে যেতো—শুরু হ'ত কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া।

ফরাসী বিপ্লবের কাহিনী প'ড়ে কেমাল ফরাসী দার্শনিকদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'লেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিপ্লবটি এক নূতন যুগের সূচনা করেছিল। কেমালের স্পন্দিত হৃদয়ে এই বিপ্লবের কাহিনী একটি নূতন উদ্দীপনা, নূতন ভাব জাগিয়ে তুল্‌লে। কেমালের মনে হ'ল, এই কুসংস্কার, সুলতানের এই শাসনতন্ত্র, ধর্ম্মযাজকদের এই নিপীড়ন সমস্ত ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিতে হবে। আজ তুরস্ক যে সমস্ত বন্ধনে আবদ্ধ সেই সমাজের বন্ধন, সংস্কারের বন্ধন, অজ্ঞতা আর অশিক্ষার বন্ধন, মধ্য-যুগের আচার-অনুষ্ঠান আর অন্ধ ঐতিহ্যের বন্ধন—এই সমস্ত বাহিরের এবং ভিতরের কঠিন শৃঙ্খলগুলি ভেঙে জাতিকে নতুন ক'রে মুক্ত-জীবনের স্পর্শে জাগিয়ে তুলতে হবে। স্বাধীনতা এবং সাম্যের আদর্শ প্রচার করবার জন্য দুঃসাহসে ভর ক'রে কেমাল একখানা কাগজও বার করলেন।

কাগজ বার করেছিলেন অত্যন্ত গোপনে কিন্তু যথাসময়ে গোয়েন্দাদের হাতে গিয়ে পড়লো। সুলতানের কাছে খবর গেল কেমাল বলে একটা ছেলে একখানা কাগজ বার ক'রে সুলতানের কার্য্যের প্রতিবাদ করছে। মহামহিম সুলতানের কার্য্যের সমালোচনা করা হয়েছে, এতদূর স্পর্দ্ধা! যেদিন কেমাল সামরিক কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ পেলেন সেই দিনই তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে, ইস্তাম্বুলে চালান ক'রে দেওয়া হ'ল।

সেখানে ১৫ দিন হাজত বাসের পর তাঁকে দামাস্কাসে নির্ব্বাসিত করা হ'ল। কেমাল তখন সুলতানের চোখে "বিপজ্জনক ব্যক্তি", কাজেই তাঁকে আর শহরের মধ্যে রাখা নিরাপদ নয়।

দামাস্কাসে নির্ব্বাসিত হয়ে কেমাল নিজেকে জনসাধারণের নেতা ব'লে মনে করলেন। দণ্ডের মধ্য দিয়ে সুলতান তাঁর নেতৃত্ব এবং বিদ্রোহজনক আদর্শবাদকে যেন স্বীকার ক'রে নিলেন। কেমাল দামাস্কাসে "ওতন" ব'লে এক দল গঠন করলেন। এরা গোপনে বিদ্রোহাত্মক প্রচারকার্য্য চালাতো। 'ওতন' শব্দের অর্থ স্বদেশ। কেমাল এই দলের নেতা হ'লেন এবং দামাস্কাসে চাষা, মুটে, কুলি-মজুর সকলের সঙ্গে মিশে তাদের কাছ থেকে সুলতানের অত্যাচারের প্রমাণ সংগ্রহ করতেন। দামাস্কাসে কেমাল চাষীদের সঙ্গে খড়ের গাদায় শুয়ে রাত কাটাতেন। আর একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এদের মধ্যে থেকেও কামাল সর্ব্বদা ইয়োরোপীয় পোষাক প'রে থাক্‌তেন, কেননা তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তুর্কীদের ইয়োরোপীয় ভাবধারাও আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত ক'রে সুসভ্য ক'রে তোলা।

কিন্তু 'ওতন' দলের খবর ইস্তাম্বুলে গিয়ে পৌঁছতেই দামাস্কাস্ থেকে সরিয়ে তাঁকে জাফা ব'লে একটা শহরে নির্ব্বাসিত করা হ'ল।

জাফায় এসে চতুর কেমাল সেখানকার শাসনকর্ত্তার সঙ্গে ভাব ক'রে নিলেন। কেমালের সুমিষ্ট ব্যবহার, দেহের অপূর্ব্ব গঠন এবং সদাপ্রফুল্ল বালক-সুলভ চপল স্বভাব দেখে শাসনকর্ত্তাও মুগ্ধ হয়ে গেলেন, এবং এই সুযোগে কেমাল অবাধে প্রচারকার্য্য চালাতে লাগলেন। এই সময় আনোয়ার পাশা নামে আর একজন নবীন তুর্কী বিদ্রোহী "তরুণ তুরস্ক" নামে একটি সঙ্ঘ গ'ড়ে তোলেন; কেমাল পাশা দলবল নিয়ে আনোয়ার পাশার দলে যোগ দিলেন।

এদিকে সুলতান জাফার শাসনকর্ত্তাকে হুকুম দিলেন কেমালকে যেন গ্রেফতার করা হয়। কেমালকে সুলতান ভয় করতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু জাফার শাসনকর্ত্তা ব'লে পাঠালেন যে মিশরে

বিদ্রোহ দমন করতে যে সেনাদল পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে কেমালকেও পাঠানো হয়েছে। সুলতান স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লেন। এদিকে শাসনকর্তার স্নেহে গ্রেফতারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কেমাল গোপনে সালোনিকায় এসে নিজের দলকে শক্তিশালী ক'রে গ'ড়ে তুল্‌ছেন; অন্যান্য বিপ্লবীদের মতো তাঁরও প্রথম কাজ হ'ল গবর্ণমেণ্টের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রে নিজের দলকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুদৃঢ় করা। মিশরে পাঠানো হয়েছে শুনে সুলতান নিশ্চিন্ত ছিলেন এবং কয়েকদিন পরে কেমালের কথা একেবারে ভুলে গেলেন।

জাফায আর সালোনিকায যখন দল গ'ড়ে উঠছিল তখন কেমালের মন প'ড়ে থাকতো যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। 'তরুণ তুরস্কে'র প্রধান লক্ষ্য ছিল যুদ্ধনীতিতে তরুণ তুরস্কজাতি যেন সেকালের তুর্কীদের চেয়েও অধিকতর পারদর্শী হয়ে ওঠে। সুলতানের অত্যাচার থেকে তুরস্ককে বাঁচাতে গেলে-যে যুদ্ধের প্রয়োজন, সশস্ত্র আক্রমণের প্রয়োজন, একথা আনোয়ার এবং কেমাল দু'জনেই স্বীকার করতেন এবং এই রণনীতি অনুসরণ ক'রে চল্‌তেন। দলের লোকদের যোদ্ধা করতে গেলে দলপতিকেও সমর-বিজ্ঞান শিখতে হবে, সৈনাধ্যক্ষের ক্ষমতা অর্জ্জন করতে হবে; কেমাল ১৯০৮ সালে সুলতানের সেনা-দলে যোগদান করলেন।

সুলতানের সৈন্যদলে যোগদান করার পরই কেমালের নাম তুর্কী সৈন্যদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। সৈন্যদলের কলেজে যুদ্ধ-বিদ্যায় তিনি প্রভূত জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং তাঁর সেই শিক্ষা তিনি বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে লাগলেন। যুদ্ধের প্রত্যেকটি বিষয় তিনি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে শেখবার চেষ্টা করতেন এবং

অবসর সময়ে সেই সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে চিন্তা করতেও তাঁর ভালো লাগতো!

এমনি ক'রে সৈন্যদলে তিনি যখন বিখ্যাত হয়ে উঠছিলেন তখন বীরত্ব দেখাবার তাঁর এক সুযোগ এলো। ইতালী এই সময় ত্রিপলী আক্রমণ করলে। ইতালী এবং তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। এই যুদ্ধে কেমাল আর আনোয়ার পাশার বীরত্বের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কেমাল কর্ণেলের পদে উন্নীত হন। আনোয়ার পাশা এর পরই তুরস্কের যুদ্ধ-মন্ত্রীরূপে সুলতানের প্রীতিভাজন হয়ে ওঠেন।

আনোয়ার এবং কেমাল ঢু'জনে সহকর্ম্মীরূপে এতদিন কাজ ক'রে এসেছেন কিন্তু আনোয়ার যুদ্ধবিভাগের মন্ত্রী হয়েই তাঁর সমরনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক মত পরিবর্ত্তন করেন। ১৯১৪ সালে যখন মহাযুদ্ধের ধ্বংসবহ্নি সমগ্র ইয়োরোপের বুকে প্রজ্বলিত হ'ল তখন আনোয়ার তুরস্কের সমরসচিব। তিনি ঘোষণা করলেন যে তুরস্ক জার্ম্মানীর পক্ষ গ্রহণ ক'রে এই যুদ্ধে যোগদান করবে। কিন্তু কেমাল ভেবে দেখেছিলেন যে এই যুদ্ধে জার্ম্মানী সম্ভবত পরাজিত হবে এবং মিত্রশক্তির সমবেত আক্রমণের ফল না দেখে তুরস্কের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া নিতান্তই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক হবে। কিন্তু আনোয়ার সমরসচিব, তিনি সামান্য একজন কর্ণেলের কথা শুনবেন কেন? তিনি তাঁর পথে চল্‌তে লাগলেন। তুরস্ক জার্ম্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করলে—তুরস্ক-সেনাদলের ভার নিলেন জার্ম্মান সেনাপতি ভন্ সাণ্ডার্স। কেমাল পাছে এই জার্ম্মান সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করেন কিংবা সৈন্যদলের মধ্যে আনোয়ারের বিরুদ্ধে প্রচার করেন এই ভয়ে আনোয়ার কেমালকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখলেন।

তুর্কী সৈন্যরা জার্ম্মান সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করতে লাগলো বটে কিন্তু বিদেশী সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করার মধ্যে যে হেয়তা ছিল তা' তারা ভুলতে পার্‌লে না। তুর্কী সৈন্যদের মনোরঞ্জন করতে ভন্ সাণ্ডার্স "লিমান পাশা" এই তুর্কী নাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু এতেও কোন সুবিধা হ'ল না, তুর্কীরা জার্ম্মান সেনাপতির অধীনে প্রাণ দিয়ে কিছুতেই যুদ্ধ করতে পারলে না। কেমাল সৈন্যদের মধ্যে এত খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিলেন যে তুর্কী সৈন্যেরা কেমালকেই তাদের সেনাপতিরূপে কামনা করতে লাগলো। এতে অবশ্য কেমালের কোন চাতুরী ছিল না। বাস্তবিকই তুর্কীদের মধ্যে কেমালের চেয়ে দক্ষ সেনাপতি দুর্লভ ছিল। প্রকাশ্যে ঘোষণা না করলেও তুর্কী সৈন্যদের এই অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় লিমান্ পাশা বুঝতে পেরে শঙ্কিত হ'লেন।

শেষে তুর্কীরা প্রায়ই লিমান পাশার আদেশ অমান্য করতে লাগলো। যুদ্ধ যত এগিয়ে যায় সেনাদলে বিশৃঙ্খলা ততই বাড়তে থাকে এবং সকলের মুখেই কেমালের নাম শোনা যায়। উপায়ান্তর না দেখে লিমান পাশা কামালকে ব'লে পাঠালেন, 'অবস্থা গুরুতর—তুর্কী সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।' উত্তরে কেমাল ব'লে পাঠালেন, 'সেনাপতিরূপে আমাকে সৈন্যচালনার ভার দেওয়া হোক—আমি তুর্কী সৈন্যদের পরিচালনা করবো, গোলযোগ হবে না।' কামালের উত্তর শুনে ভন্ সাণ্ডার্স হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন—একেবারে সেনাপতি! কিন্তু উপায় নেই—ভন্ সাণ্ডার্স একথা স্থির জেনেছিলেন যে তাঁর সেনাপতিত্বে তুর্কীরা বিদ্রোহ করবে, তারা চায় কেমালকে। অতএব কেমালকে সেনাপতি নিযুক্ত করতে হ'ল। সরকারী বিশেষ ঘোষণাপত্রে দেখা গেল কর্ণেল কেমাল এক লক্ষ ষাট হাজার তুর্কী সেনার সেনাপতি হয়েছেন।

কেমাল সেনাপতি-পদ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী সেনাদের মধ্যে একটা নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার হ'ল। চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনার মধ্যে কেমালের আদেশ মন্ত্রের মতো তারা মেনে চল্‌তে লাগলো। অসীম বিক্রমে যুদ্ধ ক'রে কেমাল বিরাট সৈন্যব্যূহ রচনা ক'রে পূর্ব্ব সীমান্তে মিত্রশক্তির গতিরোধ করলেন। ব্রিটিশ সৈন্য গ্যালিপলি ত্যাগ ক'রে চলে গেল এবং ককেশাস্‌ পর্ব্বতের পাদদেশে কেমাল রুশ সেনাদের সম্মুখীন হলেন। এখানেও তাঁর নির্ভীক তেজস্বিতার বলে, রুশসৈন্যেরা যে সকল তুর্কী নগর অধিকার করেছিল, সেগুলি তারা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হ'ল। কেমালের এই অপূর্ব্ব বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর জয়ের পুরস্কার স্বরূপ সুলতান তাঁকে "পাশা" উপাধিতে ভূষিত করলেন। কেমাল তাঁর শৌর্য্যের জাদুমন্ত্রে প্রাচীন তুরস্ককে জাগিয়ে তোলবার এই প্রথম সুযোগ পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। যুদ্ধের উন্মাদনায় সমগ্র তুর্কী জাতি বুঝি-বা সভ্যজগতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

এই সময় সুলতানের যুদ্ধনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হ'ত জার্ম্মান রাষ্ট্রদূত এবং জার্ম্মান সেনাপতিদের পরামর্শ অনুযায়ী। সুলতানের প্রায় কোন স্বাধীনতা ছিল না। কেমালের এই খ্যাতি এবং প্রাধান্য দেখে জার্ম্মান সেনাপতিরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা দেখলেন যে কেমাল যদি এমনি ক'রে তুরস্কের সুলতানের এবং তুর্কী জনসাধারণের প্রীতিভাজন হয়ে তুর্কী সাম্রাজ্যের মধ্যে একজন শক্তিমান্‌ সেনাপতি ব'লে পরিচিত হন্‌ তা হ'লে তাঁদের প্রভূত অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। কেমাল শক্তিশালী হয়ে উঠলে হয়তো তাঁদের তুরস্ক থেকে বিদায় নিতে হবে এই আশঙ্কায় তাঁরা সুলতানকে পরামর্শ দিলেন যাতে কেমালকে ইয়োরোপের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা

হয় এমন ব্যবস্থা করতে। সুলতান কিছুই বুঝলেন না, তিনি কেমালকে সৈন্যপরিদর্শক হিসেবে এশিয়া মাইনরে পাঠিয়ে দিলেন।

এশিয়া মাইনরে এসে কেমাল সৈন্যদের অবস্থা দেখে শঙ্কিত হ'লেন। তিনি দেখলেন যে সেখানকার সৈন্যদল এত দুর্ব্বল এবং বিচ্ছিন্ন যে মিত্রশক্তির জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। তিনি সুলতানকে জানালেন, কিন্তু জার্ম্মান সেনাপতিদের প্ররোচনায় সুলতান তাঁর কথায় কান দিলেন না। সেই বিচ্ছিন্ন তুর্কী সেনাদলকে পরাভূত ক'রে ব্রিটিশ সৈন্য ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাগ্‌দাদে প্রবেশ করলো।

এর পর ১৯১৮ সালের ৩০শে অক্টোবর তুরস্কের সঙ্গে মিত্রশক্তির সন্ধি হয়। জার্ম্মানজাতির পরাজয়ের ফলে জগতের চোখে তখন তুরস্কও পরাজিত অবমানিত জাতি, এবং মিত্রশক্তির অনুশাসন মানতে তুরস্ক বাধ্য। এই সন্ধির ফলে তুরস্ক মিত্রশক্তিকে কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌ ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল, এবং এই চুক্তি হ'ল যে মিত্রশক্তির সুবিধার জন্য আর যে সকল স্থান দখল করা দরকার তুরস্ক মিত্রশক্তিকে সেই সকল স্থান দখল করবার অধিকার দান করবে। সন্ধি হ'ল, তুরস্কের চরম দুর্দ্দশার সূচনা ক'রে।

এই বছরেই বাহাউদ্দীন এফেন্দী তুরস্কের সুলতান হ'ন। ভূতপূর্ব্ব সুলতান ছিলেন জার্ম্মানদের আজ্ঞাবহ আর এই নূতন সুলতানটি হ'লেন মিত্রশক্তির আজ্ঞাবহ। ইনি প্রথমে কেমালকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন, কিন্তু মিত্রশক্তির প্রভাবে ক্রমশ কেমালকে একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে দেখতে শুরু করলেন। কেমালের জনপ্রিয়তায় মিত্রশক্তি ভীত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁদের কথায় সুলতানও কেমালকে একটা ভয়াবহ জীব ব'লে মনে করতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন কেমালের প্রতি আদেশ হ'ল যে তাঁকে আনাতোলিয়ায় যেতে হবে—সেখান থেকে সৈন্যদলকে উঠিয়ে আনার ভার পড়েছে তাঁর উপর। যিনি তুরস্কের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি তাঁকেই সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ ক'রে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে।

সুলতান যতই নির্ব্বোধ হোন্‌ না কেন, কেমাল মিত্রশক্তির অভিসন্ধি বুঝতে পারলেন। কেমাল কূট-রাজনৈতিকদের মতোই বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি জান্‌তেন যে, মিত্রশক্তির পরামর্শ অনুযায়ী সেনাদল ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলে তুরস্ককে আর গ'ড়ে তোলা যাবে না—মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য সফল হবে। নবীন তুরস্কের অধিনায়ক কেমাল পাশার অন্তরে তখনও নিশিদিন তুরস্কের জাগরণ-কামনা দীপ্যমান ছিল। তিনি স্থির করলেন, সৈন্যদের কিছুতেই তিনি ছত্রভঙ্গ করবেন না।

আনাতোলিয়াতে এসে কেমাল খবর পাঠালেন—সৈন্যদের অবস্থা এতটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে যে আগে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ না করলে সুলতানের আদেশ মতো তাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। এই অজুহাতে কেমাল সেই নিরুৎসাহ, পরাজিত, বিক্ষিপ্ত তুর্কী সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে এক বিশাল শক্তিশালী সেনাদল গ'ড়ে তুলতে লাগ্‌লেন। নবীন তুরস্কের এরাই হ'ল প্রথম সৈনিক; সুসভ্য ইয়োরোপের মধ্যে যারা আপন বীর্য্যবলে সম্মানের স্থান অধিকার ক'রেছিল, এরা তাদেরই পথপ্রদর্শক বীর তুর্কী সৈনিকের দল।

ওদিকে তুরস্ককে দুর্ব্বল এবং অসহায় মনে ক'রে ইতালী ১৯১৯ সালের ২৯শে এপ্রিল আদানা বন্দর অধিকার করলে। মিত্রশক্তি এর কোন প্রতিবাদ করা প্রয়োজন বিবেচনা করলে না।

এর পরই ১৪ই মে ব্রিটিশ নৌবহর সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী স্মার্ণা অধিকার করলে ; তুরস্কের এতেও প্রতিবাদ করবার কিছু রইল না। কিন্তু পরের দিন যখন তুরস্কের চিরশত্রু গ্রীকরা স্মার্ণায় অবতরণ করলে, তখন স্মার্ণার অধিবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ক্রুদ্ধ জনতা গ্রীক্‌দের আক্রমণ করলে, কয়েকজন গ্রীক হত হ'ল। গ্রীকরা নির্ম্মমভাবে এর প্রতিশোধ নিলে। তুর্কীদের রক্তে স্মার্ণার পথঘাট লাল হয়ে গেল। হত্যা এবং লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে গ্রীকরা স্মার্ণায় ঘাঁটি স্থাপন করলে।

কেমাল পাশা সমস্তই শুনলেন। স্মার্ণার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়াকে উপলক্ষ্য ক'রে সমগ্র তুরস্ককে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। অক্ষম বিদেশী-পরিচালিত সুলতানের দিকে তাকিয়ে থাক্‌লে কোন ফল হবে না। কেমাল পাশা এরজিরুমে কয়েকজন অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে ১৯১৯ সালের ২৭শে জুলাই এক কংগ্রেস আহ্বান করলেন—স্বয়ং সভাপতি হ'লেন। তুরস্কের নবজাগরণের স্বপ্ন যাদের বুকে ছিল সেই সব নবীন তুর্কীরা এসে এই কংগ্রেসে যোগদান করলে।

প্রথম হ'লেও এ কংগ্রেস আশাতীত সাফল্যের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। এই কংগ্রেসে প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল—সুলতান ও তাঁর শাসন-পরিষদকে জানানো হচ্ছে যে তাঁরা অচিরে স্মার্ণা থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করুন। অন্যথা এই কমিটি ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করবে। উত্তরের জন্য কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করা হবে, তার মধ্যে যদি সুলতানের উত্তর না আসে তাহ'লে কেমাল পাশার অধিনায়কত্বে এই কমিটি ইচ্ছামত কাজ করবে। নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হ'ল কিন্তু কোন উত্তর এলো না। তখন কেমাল পাশা নিজেই তুরস্কের ভাগ্যগঠনের কাজে এগিয়ে এলেন।

আনাতোলিয়ায় কেমাল যে বিপুল সেনাদল গ'ড়ে তুলেছিলেন তারা কামালের একান্ত অনুগত ছিল, তারা তাঁর আদেশে যে কোন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত। অরাজকতার সময়ে দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দলগঠন করেছিল, কামাল তাদেরও আহ্বান করলেন। সুশিক্ষিত সেনাদল এবং হিংস্র প্রতিহিংসাপরায়ণ আরবী দস্যুদলকে পেছনে নিয়ে কেমাল অবলীলাক্রমে স্মার্ণা থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করলেন। স্মার্ণার যুদ্ধে কেমাল যে সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন আধুনিক কালের ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

কেমালের এই ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে, তাঁর এই আশাতীত বিজয়-লাভে মিত্রশক্তি বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁদের পক্ষ থেকে সুলতানের উপর নানা চাপ দেওয়া হ'তে লাগলো। অবশেষে কেমালকে সুলতান মিত্রশক্তির পরামর্শ-অনুযায়ী "রাজদ্রোহী দস্যু" ব'লে ঘোষণা করলেন এবং তাঁর উপর থেকে সমস্ত সরকারী অনুগ্রহ তুলে নেওয়া হ'ল।

কেমাল কিছুমাত্র হতাশ হ'লেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ এ্যাঙ্গোরা শহরে কংগ্রেস আহ্বান ক'রে এক জাতীয় ব্যবস্থাপক সভা গঠন করলেন। এই ব্যবস্থাপক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে কেমাল জাতির নিকটে আদেশজারী করতে লাগলেন। এমনি ক'রে তুরস্কে দু'টি গবর্ণমেণ্ট চল্‌তে লাগলো।

তুরস্কের নবীন যুবকদের অন্তরে যে স্বপ্ন ছিল কেমাল পাশার স্মার্ণা বিজয়ে সে স্বপ্ন যেন সত্যে পরিণত হ'ল। তুরস্কের জনসাধারণ এতদিন যে অত্যাচার, যে স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য ক'রে এসেছে শতাব্দীকালের সেই অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে কেমাল পাশা তাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। তারা কেমালকে তাদের একান্ত হিতার্থী বন্ধু এবং রক্ষাকর্ত্তা রূপে বরণ ক'রে নিলে।

এদিকে মিত্রশক্তি দেখলেন যে তুরস্কের উপর তাঁদের আধিপত্য করা চলবে না। তাঁরা এতদিন পর্য্যন্ত কেমাল পাশার হুম্‌কি গ্রাহ্য করেননি। তাঁরা কেমাল পাশা এবং তাঁর ব্যবস্থাপক সভাকে একটা দল ব'লেই দেখতেন। কিন্তু ১৯২২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর যখন কেমাল বিজয়ী বীরের মতো স্মার্ণায় প্রবেশ ক'রে স্মার্ণা দখল ক'রে নিলেন তখন কেমালের জাতীয় পরিষদ সম্বন্ধে তাঁদের মত পরিবর্ত্তন করতে হ'ল। কেমালের এই বিজয়-অভিযান লক্ষ্য ক'রে তাঁরা তুরস্কের সঙ্গে নূতন সন্ধি স্থাপনা কবতে সম্মত হ'লেন। সেই মাসেই মুদীয়ানা শহরে কেমাল পাশার জাতীয় পরিষদের এগারো জন দূতের সঙ্গে মিত্রশক্তি সন্ধির সর্ত্তাবলী আলোচনা করলেন এবং ব্রিটিশ সৈন্যরা কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌ ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল। মুদীয়ানার সভায় এ্যাঙ্গোরার জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে শাসনপরিষদ ব'লে স্বীকার করা হ'ল।

মুদীয়ানার সভার পর "লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌স্‌"এ ইয়োরোপের প্রধান শক্তিনিচয়ের মাঝে তুরস্কের সমান আসন নির্দ্দিষ্ট হ'ল। তুরস্ককে ইয়োরোপের ঐতিহাসিকরা এতদিন "ইয়োরোপের রুগ্‌ণ ব্যক্তি" আখ্যা দিয়েছেন; আজ অকস্মাৎ ইয়োরোপের রাষ্ট্রনেতারা দেখলেন সেই রুগ্‌ণ ব্যক্তিটিই তাঁদের মাঝে সমান সম্মানের আসন অধিকার করেছে—আজ তুরস্ক সুস্থ, সবল এবং জয়দৃপ্ত এক মহাজাতি। কেমাল পাশার এই নবীন তুরস্ক।

এর পর কেমাল দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলেন। ১লা নবেম্বর তিনি ইস্তাম্বুলের সুলতানের গবর্ণমেণ্ট অচল ব'লে ঘোষণা করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে এ্যাঙ্গোরার জাতীয় পরিষদই একমাত্র শাসনপরিষদ,

তুরস্কের ভাগ্য-নিয়ন্তা। ৪ঠা নবেম্বর জাতীয় পরিষদের পক্ষ থেকে তাফেৎ পাশা ইস্তাম্বুলের সরকারী দপ্তরখানা অধিকার করলেন। সুলতান মাণ্টায় পলায়ন ক'রে প্রাণ বাঁচালেন। পরদিনই তুরস্ককে গণতন্ত্র ব'লে ঘোষণা করা হ'ল—প্রাচীন অটোম্যান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হ'ল। প্রাচীন যুগের সমাধিক্ষেত্রের উপর নবীন তুরস্ক নব অভ্যুদয় লাভ করলে—তুর্কী গণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি হ'লেন গাজী মোস্তাফা কেমাল পাশা।

এই সময় লোজান শহরে ইয়োরেপের বিভিন্নজাতি একটা নূতন সন্ধির ব্যবস্থার জন্য সম্মিলিত হ'লেন; তুরস্ক ইয়োরোপীয় জাতি হিসেবে এই সভায় আহূত হ'ল, তবে সুলতানের স্বেচ্ছাতান্ত্রিক তুরস্ক নয়—কেমালের গণতান্ত্রিক তুরস্ক।

২০শে নবেম্বর ইস্‌মেৎ পাশা লোজানের আন্তর্জ্জাতিক মিলন-সভায় তুর্কী গণতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করলেন এবং সেই সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে তুরস্কের জাতীয় দলের সমস্ত দাবী গ্রাহ্য এবং ন্যায্য স্বীকার করিয়ে নিলেন।

এর পর তুরস্কের সমাজ-জীবনে যে পরিবর্ত্তনের বন্যা দেখা দিল তা নাৎসী জার্ম্মানী এবং ফ্যাসিস্ত্ ইতালীর চেয়ে বিস্ময়কর। রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কেমাল তুরস্ককে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুল্‌লেন। সর্ব্ববিধ অন্ধ সংস্কার তিনি কঠোর হস্তে দূর করলেন। একদিকে যেমন তুরস্ক থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য বিতাড়িত হ'ল, অন্যদিকে তেমনি দেশের আভ্যন্তরিক সমস্ত দুর্ব্বলতা হেয়তাকে নির্ব্বাসিত করা হ'ল। কেমাল ঘোষণা করলেন রাষ্ট্রনৈতিক কারণে "খলিফা" পদের আর প্রয়োজন নেই। আইন ক'রে তিনি তুর্কীদের বেশভূষা পরিবর্ত্তন করলেন। ফেজটুপী পরা নিষিদ্ধ হ'ল, ইয়োরোপীয়

বেশভূষা ছাড়া অন্য বেশ ধারণ আইনতঃ দণ্ডনীয় হ'ল। পর্দ্দা-প্রথা তিরোহিত হওয়ার ফলে তুর্কী নারীরা নূতন সূর্য্যালোক দেখতে পেলে—সভ্য মানুষ হিসেবে তুর্কী নারীসমাজ তুরস্কের সমাজ-জীবনে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করলে। শিক্ষা স্ত্রী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলের সহজপ্রাপ্য হ'ল—প্রাচীন বর্ণমালার পরিবর্ত্তে লাতিন বর্ণমালা প্রবর্ত্তিত হ'ল। তুরস্কের সমাজ-জীবন সম্পূর্ণ ইয়োরোপীয় সমাজের অনুকরণে গঠিত হ'ল। প্রবল ঝড়ের পর মেঘমুক্ত অকাশের মতো তুরস্কের ভাগ্যাকাশ নির্ম্মেঘ নীলবর্ণ ধারণ করলো। মানুষের যে-চেতনা সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে মানুষকে ক্লীব ক'রে রাখে—সেই চেতনাকে যে কত সহজে উদ্বুদ্ধ করা যায় কেমালের কাছে জগতের লোক সেই শিক্ষাই লাভ করলে।

এ যুগে জন্মগ্রহণ করলেও কেমালের বুকে প্রাচীন কালের অসীম শৌর্য্য সঞ্চিত ছিল। তিনি বাহুবলে শুধু শত্রুজয় করেন'নি, দেশের মধ্যে যারা তাঁকে বাধা দিয়েছে তাদের তিনি কণ্ঠরোধ করেছেন। জীবনে উচ্চশিক্ষা তিনি কোনদিন পান্‌নি অথচ দেশের সমস্ত দুর্দ্দশার মূল কোথায় তা খুঁজে বার করতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক যুগে তুর্কী জাতির সকলের চেয়ে যা বড় প্রয়োজন তাই তিনি দান করেছিলেন—তিনি তুরস্ককে ইয়োরোপীয় সভ্যতায় দীক্ষিত ক'রে জীর্ণ সংস্কারের প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে গিয়েছেন। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন দেশগুলি নূতন ভাবধারা গ্রহণ করবে কেমালের আদর্শে।

কেমাল শত্রুজয় করেছিলেন, দেশজয় করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সকলের বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল তিনি তুর্কী জাতির হৃদয় জয় করবেন। এ ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয়েছিল। সমগ্র তুর্কী জাতি তাঁরই উপর

নিজেদের শুভাশুভ নির্ণয় করার ভার দিয়েছিল। তারা তাঁর নাম দিয়েছিল "আতাতুর্ক", তুরস্কের পিতা। সালোনিকায় যে ছেলেটি স্কুল থেকে ফিরে এসে বই শ্লেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, সেই নিরক্ষর বালকটিই একটা জাতিকে বহু শতাব্দীর দুর্গতি থেকে উদ্ধার ক'রে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসভ্য জাতিতে পরিণত করলে। ইতিহাসে এ পরিবর্ত্তনের কাহিনী এই প্রথম লিপিবদ্ধ হ'ল। একটি মাত্র লোকের বলে তুর্কী জাতির চরিত্র গঠিত হ'ল।

১৯৩৯ সালে অকস্মাৎ যেদিন এই কর্ম্মবীরটি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন সেদিন পৃথিবীর বুকে হাহাকার উঠল। মিশর, আরব, পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রাচীন দেশগুলি কেমাল আতাতুর্কের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলে। তাঁর মৃত্যুতে কেবল·তুরস্কের জনসাধারণ যে তাদের প্রিয় আতাতুর্ককে হারিয়েছে তা' নয়, সমগ্র প্রাচ্য-জগৎ একজন শক্তিমান কর্ম্মবীরকে হারিয়েছে যিনি ইয়োরোপের কাছে এশিয়ার গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

তাঁর নিজের সংসার ব'লে কিছু ছিল না, সমগ্র তুর্কী জাতিকে তিনি তাঁর শৌর্য্যের, তাঁর প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তির উত্তরাধিকারী ক'রে গেলেন। অক্ষম, অশক্ত তুর্কী জাতিকে তিনি হাত ধ'রে উন্নতির পথে, নবজীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এই ছিল তাঁর কাজ। যে দিন তাঁর কাজ শেষ হ'ল সে দিন তুর্কীরা শিক্ষিত, সুসভ্য হয়ে উঠেছে, তারা শিখেছে তাদের জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে, তারা ফিরে পেয়েছে তাদের স্বাস্থ্য, তাদের বাহুবল।

মুসোলিনী

ইতালীর উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে পাহাড়ের উপর একটি ছোট গ্রাম আছে নাম তার ভারানো-ডি-কষ্টি। ইতালীর বিখ্যাত প্রেদাপ্পিও জেলার অন্তর্গত এই গ্রামটি। ছোট ছোট পাথরের বাড়ি, নীচে দিয়ে কুলু কুলু ধ্বনি করতে করতে ছোট্ট একটি তটিনী সর্ব্বদা ছুটে চলেছে। কোথাও কোন শব্দ নেই, শহরের কোলাহল নেই, সভ্যতার দম্ভ নেই এখানকার বাসিন্দাদের। তাদের আয় অল্প, আকাঙ্ক্ষাও নেই মস্ত বড় হবার। তারা ভালবাসে তাদের প্রতিবেশীকে, আর ভাবে তাদের দেশের কথা—তাদের বড় আপনার ইতালীর কথা।

এই গ্রামে একটি অদ্ভুত লোক বাস করতো নাম তার আলেসান্দ্রো মুসোলিনী। জাতিতে সে কর্ম্মকার, ব্যবসাও তার কর্ম্মকারের। দু'একটা বাষ্পীয় যন্ত্র তখন তার কেনা হয়েছে, সেই যন্ত্রগুলির সাহায্যে সে তার কাজ ক'রে যায়, আর তার সামনে ব'সে থাকে তার ছেলে বেনিটো। সে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ তার বাপকে নানা প্রশ্নে বিব্রত ক'রে তোলে—যন্ত্রের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ তার বড ভালো লাগে। যন্ত্রের রহস্য ঐ ছোট ছেলেটিকে বোঝাতে গিয়ে বাপের প্রাণান্ত হয় তবু সাধ্যমতো সে ছেলের কৌতূহল মিটিয়ে দেয়। পিতা-পুত্রে এমনি ক'রে ভারি ভাব জমে ওঠে।

কিন্তু কর্ম্মকার হ'লেও আলেসান্দ্রো নিজেকে ইতালীর একজন বিশিষ্ট সন্তান ব'লে মনে করে। ইতালীর ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোল্‌বার দায়িত্ব তারও আছে এই ছিল তার বিশ্বাস। সে মনে করতো অক্ষম বাপ-মাকে প্রতিপালন করা যেমন সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য

তেমনি একজন ইতালীয় হয়ে ইতালীর দুঃখ মোচন করবার চেষ্টা করাও তার কর্ত্তব্য।

ইতালীর তখন ঘোর দুর্দ্দিন। চারদিকে প্রবল দুর্ব্বলকে বঞ্চিত করছে। পরাক্রান্ত অষ্ট্রিয়া তাকে প্রাণপণে শোষণ করবার চেষ্টা করছে আর দেখছে ইতালীর মেরুদণ্ড যাতে চিরদিন বলহীন হয়েই থাকে। দেশের যারা ছোটখাটো জমিদার গোছের লোক তারা অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের মাথায় পা দিয়ে চলেছে। আরও অনেক দুর্দ্দশা অনেক অত্যাচারের কাহিনী প্রতিদিন ইতালীর ঘরে ঘরে শোনা যেত। দেশের লোকের কাছেই ইতালীর জনসাধারণ সকলের চেয়ে বড় অবহেলা বড় লাঞ্ছনা পেয়েছে।

কর্ম্মকার আলেসান্দ্রোর মনে সর্ব্বদাই নানা চিন্তা জাগতো। তার একটি ছোট সরাইখানা ছিল। সেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার প্রতিবেশীরা এসে জমা হ'তো। কর্ম্মকারের জীবনযাত্রা ভুলে গিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে ইতালীর নানা সমস্যার আলোচনা করতো তার 'বন্ধুদের' সঙ্গে। কেমন ক'রে ইতালী পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াবে. কেমন ক'রে আজ যারা পদদলিত তারা পুরোপুরি মানুষের অধিকার পাবে, বাঁচতে পারবে মানুষের মতো হয়ে নিরাপদ শান্তিতে, এই সব সমস্যা ছিল তাদের নিত্য আলোচনার বিষয়। তাদের চিন্তাধারা তাদের অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতো—তারা কর্ম্মের প্রেরণা পেতো।

কিন্তু সত্যই যখন তারা ইতালীর কথা সারা অন্তর দিয়ে ভাবতে শুরু করলে, দেশের দুর্দ্দশায় তাদের প্রাণ কাঁদলো, তখন পুলিশের নজর পড়লো তাদের এই সান্ধ্য আসরটির উপর—তারা নিতান্তই বিব্রত হয়ে উঠলো।

তাদের বিতর্ক এবং আলোচনার আর একটি শ্রোতা ছিল,—সে বেনিটো। বালক বেনিটো একমনে সব শুনতো আর অবাক হয়ে ভাবতো যে এতে 'পুলিশের' আনাগোনা করবার কী আছে।

বালক বেনিটোর প্রথম রাজনীতিতে হাতে খড়ি হ'ল তার পিতার সরাইখানায়—গ্রামের নিরক্ষর এবং অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের কাছে। স্বপনপুরীর রাজকন্যা আর আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা না ভেবে অখ্যাত এই গ্রাম্য বালকটি ভাবতে শিখলে তার জাতির ভবিষ্যৎ, ভালোবাসলে তার জন্মভূমিকে, বার বার তার মন ব'লে উঠলো—ইতালী আমার!

এই কর্ম্মকার সন্তানটিই আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতির ভাগ্যবিধাতা, ইতালীর গৌরব সিনর বেনিটো মুসোলিনী!

আজ তাঁর অঙ্গুলি-হেলনে সমগ্র ইতালীয় জাতি নিমেষে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত 'মুসোলিনী' নাম লোকের মুখে মুখে। তাঁর আদর্শ হয়তো আমাদের গ্রহণযোগ্য নয় তবু সেই বিরাট কর্ম্মবীরকে আমরা নমস্কার না জানিয়ে পারি না। তাঁর জীবনে যে দুর্ব্বার কর্ম্মশক্তির বিকাশ হয়েছে তার কাছে আজ সারা জগৎ মাথা নত করেছে।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই মুসোলিনী জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন ছিল ওখানকার একটা পর্ব্বদিন—কে একজন সন্ন্যাসীর স্মৃতিরক্ষার উৎসব। সেই উৎসবের মাঝে মুসোলিনী ভূমিষ্ঠ হ'লেন। সেইজন্যই বোধ হয় আজ তাঁর শৌর্য্যবলে ইতালী তার সুপ্রাচীন গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উৎসবে মুখর হয়ে উঠেছে।

বেনিটোর মা রোসার একটি পাঠশালা ছিল। তাঁর ছেলের বিদ্যারম্ভ হ'ল সেখানেই, তাঁরই হাতে।

বালকটির কিন্তু লেখাপড়া ছাড়া আর সব বিষয়েই বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল। পাঠশালায় মুসোলিনী খুব ব্যস্ত থাক্তেন। সবাই যখন সুর ক'রে পড়া বল্‌ছে তখন তাঁর একখানা হাত একটি ছেলের পেছনে গিয়েই আবার চকিতে স্বস্থানে ফিরে এলো—ছেলেটি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো। মা শাস্তি দিলেন ছেলেকে। ছেলেকে কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হ'তে দেখা গেল না। তার মাথায় তখন আর একটা নতুন কিছুর আবিষ্কার হয়ে গেছে।

এমনি ক'রে কাট্‌তো তাঁর পাঠশালার ঘণ্টাগুলি। এ-ছাডা তাঁর আরও কাজ ছিল। পাখীর বাসা থেকে ডিম আহরণ করা বালক মুসোলিনীর একটা মস্ত কাজ ছিল। কেমন ক'রে একটা প্রাণী ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে—জীবনের এই বিচিত্র ক্রম-বিকাশ দেখতে বালক মুসোলিনীর খুব ভালো লাগতো। তিনি ডিমগুলি নষ্ট না ক'রে বাসাতেই রেখে দিতেন, কেবল তাঁর কাজ ছিল রোজ গিয়ে দেখে আসা ডিমটার কতদূর কী হ'ল। দুরন্ত হ'লেও বাল্যকাল থেকে তাঁর এমনিই একটা গভীর অনুসন্ধিৎসা ছিল।

পাঠশালায় শান্ত হয়ে বই নিয়ে বসা তাঁর পক্ষে অসহ্য হ'তো। কোন ফাঁকে বেরিয়ে পড়তেন, ছুটে যেতেন সাদা সাদা বকের ঝাঁক যেখানে পাহাড়ের গায়ে গায়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বক ধ'রতে বড় ভালো লাগতো—বক ধরা খুব শক্ত তবু তাদের পেছনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এক এক বেলা কেটে যেতো।

কিন্তু এই বালকটির দৌরাত্ম্যে পাড়ার লোকে অস্থির হয়ে উঠলো। বাগানে ফল পাকলেই সদলবলে মুসোলিনী আত্মসাৎ করতেন—এটা

তাঁর একটা উৎসব ব'লে মনে হ'তো। এ-উৎসব পাড়ার লোকের ভালো লা'গতো না নিশ্চয়ই। তারা আলেসান্দ্রোকে বল্‌লে, ছেলেকে শাসন করো।

আলেসান্দ্রো আর কোন উপায় না দেখে নিজের কারখানায় ছেলেকে কাজ শেখাতে লাগলেন। এই কারখানায় বেনিটোর দিন-গুলি কেমন ক'রে কাটতে লাগলো তার কথা পূর্ব্বেই বলেছি। কিশোর-চঞ্চল মনের উপর দেশের দুর্দ্দশার কাহিনী গভীর রেখাপাত ক'রে যেতো আর তার সঙ্গে সঙ্গে বালকের চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠতো নতুন ইতালীর ছবি, তার বড় বড় সুন্দর শহর—যেখানে বিপুল দারিদ্র্য নেই, নেই অপমান, নেই লাঞ্ছনা। তিনি দিগন্ত-বিস্তৃত সমতল ভূমির পানে তাকিয়ে থাকৃতেন। দূরে রাব্বি নদী ব'য়ে যাচ্ছে—নিস্তব্ধ শান্ত দুপুরে রাব্বির কলস্রোত তাঁর কানে বাজতে থাক্‌তো। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, ঐ ধূসর প্রান্তরে একটি সুন্দর নগর গ'ড়ে উঠেছে—সে নগরে পৃথিবীর যত ভালো লোক বাস করে—তাদের সকলেই তাঁর বাবার মতো বলিষ্ঠ, কর্ম্মী, উদার।

এক এক সময় কিন্তু তাঁর বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করতো। বাবার কাছ থেকে পালিয়ে চ'লে আস্‌তেন সেই ছোট নদীটির ধারে। মাঝে মাঝে এর দুই কূল ছাপিয়ে যেতো বর্ষার জলে। উপলখণ্ডে আহত হয়ে নদীর স্রোত তীব্র হ'তো—তার কলগানে বনভূমি মুখর হয়ে উঠতো। এই নদীর ধারেই ছিল বালক মুসোলিনীর সাম্রাজ্য। তিনি একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে এর দুর্ব্বার গতিবেগ লক্ষ্য করতেন আর তাঁর মনে হ'তো এই ছোট্ট নদীরও গতি কি তিনি রোধ করতে পারেন না? তার পরেই চল্‌তো বাঁধ দেওয়ার আয়োজন, অসংখ্য শিলাখণ্ড সংগ্রহ ক'রে বিপুল অধ্যবসায়ের সঙ্গে নদীর বাঁধ দিতে

দিতে বেলা প'ড়ে আস্‌তো। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আস্‌তো পাহাড়ের মাথার উপর তখন তিনি আর তাঁর ভাই আরনাল্‌ডো পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আস্‌তেন। রোসা ছেলে দু'টিকে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেতেন। পাশের সরাইখানায় উত্তেজনা তখন বেড়ে উঠেছে, ইতালীর অতীত গৌরবের কথা বলতে বলতে তাদের জ্ঞান নেই। বালক মুসোলিনীর কানে তাদের কণ্ঠস্বর গিয়ে আঘাত করতো আর তাঁর চোখ দু'টি জ্ব'লে উঠতো।

এমনি ক'রে বাবার কাছে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে তিনি অনেক কাজই শিখে ফেল্‌লেন। কিন্তু যখন কারিগর হয়ে উঠলেন তখন হঠাৎ তাঁর পড়াশুনায় মন লাগলো। আলেসান্দ্রোর ছেলের সম্বন্ধে আশা ছিল অনেক, তাই তিনি ছেলেকে দু'মাইল দূরে প্রেদাপ্পিও শহরে একটি স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন। বালক মুসোলিনী দস্তুরমতো স্কুলের ছাত্র হ'লেন।

প্রেদাপ্পিওতে এসে তাঁর বিপদ ঘটলো। সেখানে ছেলেরা দু'মাইল দূর থেকে আগত এই গ্রাম্য ছেলেটাকে কিছুতেই তাদের মধ্যে একজন ব'লে গ্রহণ করতে রাজি হ'ল না। তারা সংঘর্ষ বাধালে। পাথর ছুঁড়ে অতর্কিতে প্রহার দিয়ে মুসোলিনীকে তাড়াবার জোগাড় করলে। একা মুসোলিনী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে চল্‌লেন। কিন্তু শেষকালে বিরোধের মধ্য দিয়ে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তিনি স্কুলের ছেলেদের দলের সর্দ্দারি করতে লাগলেন।

তাঁর দলের উপদ্রব প্রেদাপ্পিওর আশে-পাশের লোকদের প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুল্‌লে।

একদিন মুসোলিনী সদলবলে এক বাগানে আপেল চুরি করতে গেছেন। গাছে উঠে যখন আপেল পাড়া এবং খাওয়া পুরাদমে চলেছে

—তখন শব্দ পেয়ে বাগানের মালীটা বন্দুকের দু'টো ফাঁকা আওয়াজ করলে। কতকগুলো ছেলে ভয়ে পালিয়ে গেল। বাকি ছেলেদের নিয়ে মুসোলিনী নির্ভয়ে আবার আপেলের দিকে মন দিলেন। এবার কিন্তু মালীটা সত্যি সত্যি বন্দুক ছুঁড়লে। একটি ছেলের পায়ে গুলি লাগলো, সে গাছ থেকে প'ড়ে গেল। সত্যিই বন্দুক ছুঁড়েছে দেখে সব ছেলেগুলো প্রাণভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তাদের এই কাপুরুষের মতো ব্যবহার দেখে তাদের সর্দ্দার কিন্তু রাগে ফুলতে লাগলেন। আহত ছেলেটাকে কাঁধে ক'রে বাইরে নিয়ে এসে তার শুশ্রূষা করলেন—তাঁকে কিছুমাত্র শঙ্কিত হ'তে দেখা গেল না।

সেদিন কিন্তু সেই পলাতক বালকের দল তাদের সর্দ্দারের কাছে যে শাস্তি পেয়েছিল আজকের ইতালীতে পলাতক সৈনিক তারই চরম পরিণতি উপলব্ধি ক'রে থাকে।

প্রেদাপ্পিওর স্কুলের পড়া শেষ হ'লে তাঁকে ফাএনজায় কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হ'ল। এখানে এসে তাঁর রীতিমতো উচ্চশিক্ষা শুরু হ'ল। বাঁধা রুটিনের মধ্যে বোর্ডিংএ তাঁর দিন কাটতে লাগলো। এ-বোর্ডিংএ কোথাও কোন কর্ত্তব্যের ব্যতিক্রম হ'লে ছেলেদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হ'তো। এইখানেই মুসোলিনী প্রথম কঠোর নিয়মানু-বর্ত্তিতা শিখতে পেলেন। তাঁর চরিত্রগঠনে এই শৃঙ্খলার আদর্শ অনেকখানি কাজ করেছিল।

এই সময় থেকেই মুসোলিনীর প্রথম জগতের সঙ্গে পরিচয় ঘটতে লাগলো। বোর্ডিং হাউসের প্রাচীরের মধ্যে থাক্‌তে থাক্‌তে যখন তাঁর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো তখন তিনি বাইরে বেরুতেন। কোন কোন দিন ফাএনজার গণ্ডী ছাড়িয়ে তিনি অনেকদূর গিয়ে পড়তেন। দু'একটা শহরে বেড়াতে বেড়াতে তিনি বৃহৎ ইতালীর সান্নিধ্যে এলেন।

গ্রীষ্মের ছুটিতে তাঁর মামার বাড়িত বেড়াতে গিয়ে তিনি প্রথম রাভেন্না শহর দেখেন। এই শহরে বহু শিল্পকলার নিদর্শন ছিল। মায়ের সঙ্গে সেই সব দেখতে দেখতে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। এই প্রথম তিনি মানুষের সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি শিল্প-সম্পদের অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবি দেখতে পেলেন। তাঁর মনে হ'ল সভ্য মানুষের এর চেয়ে বড কীর্ত্তি আর হ'তে পারে না। তাঁর এই অনুভূতি আজও মনে পডলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না।

তারপরে তিনি দেখলেন মহাকবি দান্তের সমাধিস্তম্ভ। দান্তে ইতালীর জাতীয় কবি এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের রচয়িতা। তাঁরই স্মৃতিস্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে আনন্দে গর্ব্বে কিশোর মুসোলিনীর বুক ভ'রে উঠলো। আড্রিয়াতিক্ সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে মুসোলিনী তাঁর জাতিকে, তাঁর ইতালীকে নতুন ক'রে ভালো বাস্‌লেন। এত সুন্দর যে দেশ, এত গৌরব যার ইতিহাসের পাতায় পাতায়, দান্তে যে-দেশের কবি, সে দেশের দুর্দ্দিন কি কখনো স্থায়ী হ'তে পারে।

সরাইখানায় বাবার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছিলেন আজ যেন নতুন ক'রে তার অর্থ বুঝতে পারলেন। তাঁর বাবার কাছে যারা আসতো তাদের নিদারুণ অভাব আর দৈন্যের মধ্য দিয়ে দিন কাটতো। শুধু তারাই নয়, তাদের মুখে সারা ইতালীর দুর্দ্দশার কথা শুন্‌তে পেতেন। বালক হ'লেও একথা বুঝতে আর তাঁর বাকি রইল না যে ইতালীর দরিদ্র জনসাধারণের মনে একটা বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠছে। বড়লোক যারা তারা এদের সব সুখ-সুবিধা কেড়ে নিয়ে নিজেরা আরামে দিন কাটাচ্ছে—এ তারা যেন আর সইতে পারছে না। তাঁর বাবার বন্ধুরা সবাই সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষপাতী ছিল অর্থাৎ তারা

বলতো যে যদি সমাজের সকল মানুষের মধ্যে দেশের টাকাটা সমান ক'রে ভাগ ক'রে দেওয়া যায় তা'হলেই ধনী-দরিদ্রের এই প্রকাণ্ড বিভেদটা উঠে যাবে এবং দেশে শান্তি ফিরে আসবে, সকলেই সুখে বাঁচতে পারবে।

মুসোলিনী এ সব কথার কিছু কিছু বুঝতেন—অনেকটাই বুঝতেন না। শুধু তাদের উত্তেজনা, চোখেমুখে একটা ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার ভাব দেখে তাঁর মনে হ'তো যে, এদের ওপর যে অন্যায় যে পীড়ন হচ্ছে এরা তার প্রতিকার করবে প্রাণ দিয়ে এবং তবেই এদের মঙ্গল।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর খেলাধূলা আর ছেলেদের সর্দ্দারি করার বাসনা কমে আসতে লাগলো। সর্ব্বদাই তাঁর মনটা বর্ষার আকাশের মতো কেমন যেন বিষণ্ণ, ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতো।

ঠিক এই সময় অর্থাৎ তাঁর বয়স যখন তেরো কি চৌদ্দ, তখন তাঁর জীবনে একটা মস্ত পরিবর্ত্তন ঘ'টে গেল। আলেসান্দ্রো তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে কর্ম্মকারের কাজে লাগিয়ে তাঁদের বেনিটোর জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিলে চলবে না, তাঁকে বড় হ'তে হবে, সত্যিকারের মানুষ হয়ে দেশের কল্যাণ সাধন করতে হবে।

রোসা তাঁর ছেলেকে চিনেছিলেন। তিনি সংক্ষেপে বলেছিলেন "ও মস্ত কিছু একটা করবে।" স্নেহময়ী মায়ের এ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি।

অতএব তাঁকে ফর্লিমপোপালিতে এক কলেজে দেওয়া হ'ল। ঠিক হ'ল যে ওখান থেকে পাশ ক'রে বেরিয়ে মুসোলিনী ইস্কুলে মাস্টারি করবেন। গ্রাম্য কর্ম্মকার বোধ করি তাঁর ছেলের সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় উচ্চাশা পোষণ করতে সাহস করেননি।

এই কলেজ থেকে পাশ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। দু'টি বছর শুধু বইখাতার মধ্যে ডুবে থাক্‌লে তবে পাশ করা যাবে। সত্য কথা বল্‌তে কি, মুসোলিনী খুব পরিশ্রমী ছিলেন না তবে ইদানীং তাঁর পড়াশুনো করতে ভালোই লাগতো।

যাই হোক্ তিনি প'ড়ে যেতে লাগলেন। দিনরাতই যে পড়তেন তা নয়, মাঝে মাঝে তাঁর দুরন্তপনায় শিক্ষকরা বড জ্বালাতন হ'তেন। কিশোর তখন যুবক হয়েছেন। পদে পদে প্রমাদ ঘটতো, কলেজের আবেষ্টনী ছাড়িয়ে যাবার জন্য পাগল হ'তেন। কিন্তু শিক্ষকরা ওঁকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন—বোধ হয়, এই ছেলেটির মধ্যে-যে বিরাট পুরুষ আত্মগোপন ক'বে ছিল তাঁরা জান্‌তে পেরেছিলেন।

এই সময় পড়াশুনো তিনি বড কম করেননি। নানা বিষয়ের বই পড়তেন আর ভাবতেন কেমন ক'রে দেশের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করা যায়। তাঁর আর একটি নেশা ছিল তিনি নানা সাময়িক এবং প্রাচীন বই ঘেঁটে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতেন দেশের অগণিত জনসাধারণকে কেমন ক'রে নিজের আদর্শ অনুযায়ী উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

আর ভালো লাগতো তাঁর ইতিহাস পড়তে—এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে নেপোলিয়নের তুলনা করা যায়। ইতালীর অতীত কাহিনী পড়তে পড়তে তিনি যেন চোখের সাম্‌নে সিজার, তাসিতাস্‌কে দেখতে পেতেন। বইএর মার্জ্জিনে আর ক্লাশের বেঞ্চে তিনি বার বার দৃঢ়করে "রোম" এই শব্দটি লিখ্‌তেন। একদা পৃথিবীর যিনি সম্রাজ্ঞী ছিলেন, সেই মহিমময়ী রোম-নগরীর কথা ভাবতে ভাবতে তিনি যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌তেন।

ছয় বছর পরে যখন পাশ ক'রে বেরুলেন তখনও তিনি উনিশ বছর পার হননি। গুয়ালটিয়ারি ব'লে এক জায়গায় তাঁর স্কুল-মাস্টারির একটা কাজ জুটে গেল। কিন্তু প্রেদাপ্পিও প্রদেশে কারুর স্বাধীনতা ব'লে কিছু ছিল না, সকলকেই মেষপালের মতো বেঁচে থাক্‌তে হ'তো। মুসোলিনীর তা' সইবেন কেন? এক বছর না যেতেই কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘট্‌লো—তিনি এক কথায় চাক্‌রি ছেড়ে দিয়ে এলেন।

কিন্তু চাক্‌রি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও পার্‌লেন না। বাহিরের বিপুল জগৎ যেন তাঁকে আহ্বান করতে লাগলো। সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্টের চেয়ে যে তিনি অনেক বড়—বিপদের শক্তি তাঁর কাছে কতটুকু?

জীবনে তাঁর দুঃখের দিন অনেক এসেছে, বিপদ তাঁকে সারা জীবন অনুসরণ করেছে; কিন্তু এই দিনগুলির কাছে—বিপদ্ আর দুর্দ্দশার কাছে—তিনি বেশি কৃতজ্ঞ। সুখ তাঁকে কিছুই দেয়নি, সুখ তাঁর কাম্য নয়।

কাছে যা পয়সাকড়ি ছিল তাতে লোকার্ণোর একখানা টিকেট কেটে ট্রেনে চেপে বস্‌লেন। সম্বল তাঁর দুর্জ্জয় সাহস আর প্রদীপ্ত আশা। আজ তিনি বেরিয়ে পড়লেন বৃহৎ জগতের মাঝে স্বাধীন পথচারী মানুষের মতো। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি শেখবার জন্য তিনি ইতালীর সীমান্ত অতিক্রম করলেন। অন্তরের আবাল্যসঞ্চিত দুর্গম আর দুষ্প্রাপ্যকে লাভ করার বাসনা তাঁকে সাম্‌নের দিকে যেন ঠেলে দিলে।

মুসোলিনীর জীবনে এই অধ্যায়টি একটি পরম স্মরণীয় এবং রহস্যময় অধ্যায়।

লোকার্ণোতে এসে তাঁর কষ্টের অবধি রইল না। পথে পথে নিদারুণ দারিদ্র্য আর অনশন যেন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে লাগলো। কোথাও একটা কাজ পেলেন না। অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে শেষে অর্ব নগরে একটা মজুরের কাজ পেলেন। এগারো ঘণ্টা দিন-মজুরি! কাজ—ভাঙা ইট ঝুড়িতে ক'রে নীচে থেকে উপরে ব'য়ে দেওয়া; অর্থাৎ মুসোলিনী 'জোগাড়ে'র কাজ করতে লাগলেন।

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর কয়েকটা আলুসিদ্ধ খেয়ে খড়ের গাদার উপর শুয়ে রাত কাটাতেন।

কিন্তু এই অবস্থাকেই তিনি তাঁর বিধিলিপি ব'লে মেনে নিতে পারলেন না—তিনি কাজ ছেড়ে দিলেন।

আবার যে পথ সেই পথ! কপর্দ্দকহীন নিরাশ্রয় যুবক সুইষ্ জারল্যাণ্ডের পথে পথে অসংখ্য অন্নবস্ত্রহীন বুভুক্ষু ভিক্ষুকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটলো। কুৎসিত জীবনযাত্রা তাদের, কদর্য্য তাদের মনোবৃত্তি। ভাগ্যের বশবর্ত্তী হয়ে তাঁকে এই সব নানাজাতীয় হীন লোকদের সংস্পর্শে থাকতে হ'তো। কিন্তু এদের তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। সহরের জটিল জীবনযাত্রার মধ্যে এই কদর্য্যতা—এই হীন সমাজপরিত্যক্ত লোকগুলি উদরান্নের জন্য যে পথ অবলম্বন করেছিল—এই সব মিলিয়ে তাঁর মনটা যেন বিষাক্ত হয়ে যেতো।

তবু তাঁকে বাঁচতে হবে। গাছের তলায়, পোড়োবাড়ির মধ্যে, পরিত্যক্ত আস্তাবলের মধ্যে তাঁকে রাত্রিযাপন করতে হ'তো। তাতেও পরিত্রাণ নেই—নিঃস্ব ভিক্ষুকদের পুলিশে ধ'রে নিয়ে যায়। পুলিশের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে কতদিন রাত্রে তাঁকে সাধারণ পায়খানায় কাটাতে হয়েছে। যেদিন বৃষ্টি আসতো সেদিন কোথাও

আশ্রয় মিল্‌তো না। একদিন বৃষ্টির রাত্রিতে আশ্রয় খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে একটা ছাপাখানার সাম্‌নে একটা খালি পিপে দেখতে পেলেন। সেইটে উপুড় ক'রে তারই মধ্যে ব'সে রাত কাটালেন; কিন্তু ভোর হ'তেই দেখেন সাম্‌নেই পুলিশ। বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁকে হাজতে চালান করা হ'ল—অপরাধ, তিনি নিরাশ্রয়, দরিদ্র ভবঘুরে!

মুসোলিনী জীবনে এগারো বার কারারুদ্ধ হন এবং এই তাঁর সর্ব্বপ্রথম কারাবাস।

সুইয্‌জারল্যাণ্ডে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হ'তে লাগলো। কিন্তু অনাহার আর অনিদ্রা তাঁর শরীর মন দুইই যেন ভেঙে দিতে লাগলো। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ একদিন উপায় হ'ল। জেনিভার এক মদের দোকানে পিওনের একটা চাক্‌রি পেলেন।

এই সময় পারেটো নামে এক বিখ্যাত অধ্যাপক জেনিভায় তাঁর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বক্তৃতা করছিলেন। সারাদিন কাজ ক'রে সন্ধ্যাবেলায় মুসোলিনী সেই বক্তৃতা শুন্‌তে যেতেন এবং সারারাত্রি জেগে পড়াশুনো করতেন। বিশেষ ক'রে তিনি অধ্যয়ন করতেন রাজনীতি এবং জগতের বিভিন্ন দার্শনিকের সমাজনীতিসম্পর্কীয় গ্রন্থরাজি। শুধু তাই নয়, এই সময় তিনি অনেকগুলি ভাষাও শিখে ফেলেন। পিওনের চাক্‌রি ক'রে যা' উপার্জ্জন করতেন তার অনেকটাই তাঁর ব্যয় হ'তো বই কিন্‌তে। প্রায় রোজই আহার করতেন একবার, এবং সে খাদ্য বোধ করি সামান্য কৃষকের কাছেও অভক্ষ্য। তাঁর এই সুকঠোর কৃচ্ছ্র সাধন আমাদের প্রাচীন ঋষিদের তপশ্চর্য্যার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অধ্যয়ন ছিল তাঁর তপ, ইতালীর নবজাগরণ ছিল তাঁর ধ্যান, তাঁর স্বপ্ন।

জেনিভার বিপ্লবীর দল হঠাৎ তাঁকে আবিষ্কার করলে; তাঁর প্রতিভা, মনীষা এবং শিক্ষা দেখে বিপ্লবীরা তাঁকে তাদের দলভুক্ত ক'রে নিলে। কয়েকদিনের মধ্যেই মুসোলিনীর বক্তৃতা শুনে সহরে একটা সাড়া প'ড়ে গেল; তাঁর সুতীক্ষ্ণ ভাষার অন্তরালে যে বিদ্রোহের অগ্ন্যুত্তাপ ছিল তাতে সুইয্‌জারল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্ট রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁকে জেনিভা এবং লওসেন্ এই দু'টি ক্যাণ্টন থেকে নির্ব্বাসিত করলেন।

ভিক্ষুক ব'লে সুইয্‌জারল্যাণ্ডের পুলিশ যাঁকে হাজতে আটক রেখেছিল আজ তাঁরই উপর সুইস্ গবর্ণমেণ্ট আবার দণ্ডবিধান করলেন তাঁর পরাক্রমে ভীত হয়ে শাসকশ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে।

সুইয্‌জারল্যাণ্ডে থাকা আর তাঁর সম্ভব হ'ল না। ইতালী তাঁকে ডাক দিলে। ইতালীর সেনানী হবার জন্য তখন তাঁর হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে। তিনি স্বগ্রামে ফিরে এসেই সৈন্যদলে ভর্ত্তি হ'লেন। তাঁকে গ্রামের লোকেরা অভিনন্দিত করলে।

অভিনন্দন আপ্যায়ন আর কুশলপ্রশ্নের কোন্ এক ফাঁকে গ্রামের এক কৃষককন্যার সঙ্গে মুসোলিনীর বিয়ে হয়ে গেল। সে মেয়েটির নাম রাসেল গাইডি। এখন এঁর নাম সিনরা রাসেল মুসোলিনী, ইনি ইতালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর এবং ভাগ্যবিধাতার সহধর্ম্মিণী!

ভেরোনায় সেনা-নিবেশ গঠিত হ'ল। সেইখানেই মুসোলিনী সামান্য সৈনিক হিসেবে কাজ করতে লাগ্‌লেন। সামান্য সৈনিক হ'লেও তিনি ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসার বলে সামরিক বিজ্ঞানের অনেক কিছুই শিখে ফেলেছিলেন এবং তাঁর ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের সঙ্গে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সমরবিজ্ঞানের নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। তাঁরা সস্নেহে তাঁর সঙ্গে সৈন্যচালনা, আক্রমণ এবং প্রতিরোধ সম্বন্ধে

আলোচনা করতেন। এই আলোচনার মধ্য দিয়েই মুসোলিনী ইতালীয় সৈন্যদলের অনেক দুর্ব্বলতা এবং সামরিক জাতি হিসেবে ইতালীয়দের অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় পান্। ভবিষ্যৎ ইতালীর নায়কের কাছে কিছুই গোপন থাক্‌বাব উপায় ছিল না।

কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর জীবনের সকলের চেযে বড় বিপর্য্যয় ঘট্‌লো। একদিন তাঁর ক্যাপ্টেন তাঁর হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিলেন। টেলিগ্রাম খুলে মুসোলিনী চম্‌কে উঠলেন, নিমেষে যেন সমস্ত বিশ্বসংসার তাঁর কাছে অন্ধকার হয়ে গেল। একি! তাঁর মা যে মৃত্যুশয্যায়।

মৃত্যুপথ-যাত্রিণী রোসার শিয়রে তাঁর বড় আদরের বেনিটো এসে দাঁড়ালেন। রোসা কী একটা বল্‌বার চেষ্টা করলেন কিন্তু বলা হ'ল না। পুত্রের দিকে তাকিয়ে তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়লো। মুসোলিনীর চোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তাঁর বীর্য্য, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, তাঁর ধর্ম্ম সমস্তই যেন নিমিষে তুচ্ছ হয়ে গেল।

আরও কযেক মাস সৈনিকের চাকুরি ক'রে মুসোলিনী সৈনিকের কাজ ছেড়ে দিযে আবার কযেক মাস এক ছোট ইস্কুলে মাস্টারি করেন।

কিন্তু মাস্টারি করাব জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। যে অদৃশ্য শক্তি তাঁকে ডি-কস্টো গ্রামের ক্ষুদ্র কর্ম্মকারের কারখানা থেকে সুইযজার-ল্যাণ্ডের পথে পথে টেনে নিযে বেড়িয়েছিল, তাঁকে শিক্ষক করেছিল, তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল, সেই মহান্ শক্তিই তাঁকে আবার এক নতুন জীবনের পথে টেনে নিয়ে গেল। এইবার তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটবার শুভমুহূর্ত্ত দেখা দিল; তাঁর জীবনের অরুণোদয় হ'ল ইতালীর জাতীয় ভাগ্যাকাশে; বহুশতাব্দীর অন্ধকার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

একদিন ট্রেনতো প্রদেশের "পপোলো" নামে এক বিখ্যাত কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে তাঁর চাকুরি জুটে গেল। তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ ক'রে সেখানে চ'লে গেলেন। এই খবরের কাগজে লেখা থেকেই সারা দেশ তাঁকে জান্‌তে পারলে। খবরের কাগজের স্তম্ভে তাঁর যে সমস্ত লেখা বেরুতো তার তুলনা সংবাদপত্রের ইতিহাসে বিরল। তিনি ইতালীর ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে অস্ট্রিয়ার গবর্ণমেণ্টকে সচেতন ক'রে দিতেন। তাঁর ভাষা অত্যন্ত সরল এবং তেজোদৃপ্ত ছিল এবং প্রতিটি লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতো জাতির চোখের সম্মুখে।

ট্রেনতো প্রদেশ এই সময় অস্ট্রিয়ার অধীনে ছিল। অনেক আবেদন-নিবেদন করার পরও অস্ট্রিয়ার গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশটি ইতালীকে ছেড়ে দিতে রাজী হন্‌নি। শুধু তাই নয়, অস্ট্রিয়ানরা ট্রেনতোবাসী ইতালীয়ান্‌দের সমস্ত ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছিল। স্কুল-কলেজে ইতালীর ইতিহাস, ইতালীর সাহিত্য—যার সম্পদে, ঐশ্বর্য্যে সারা জগৎ মুগ্ধ—এসব কিছুই পড়তে দেওয়া হ'তো না, তার বদলে পড়তে দেওয়া হ'তো অস্ট্রিয়ান্‌দের বাহুবলের ইতিহাস, তাদের জাতীয় গৌরবের ইতিহাস! এম্‌নিতরো নানা অত্যাচার ইতালীকে সহ্য করতে হ'তো। অথচ ট্রেনতো সম্পূর্ণ ইতালী দেশের অন্তর্গত, ইতালীয়দেরই দেশ।

মুসোলিনী যুক্তি দিয়ে, আবেদন জানিয়ে অস্ট্রিয়ার গবর্ণমেণ্টকে ইতালীর এই অংশটুকু ইতালীকেই ফিরিয়ে দিতে বলতে লাগলেন কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হ'ল না। বরং মুসোলিনীর লেখায়, তাঁর যুক্তি, তাঁর মর্ম্মস্পর্শী অথচ ক্ষুরধার ভাষা মন্ত্রের মতো ট্রেনতোর অধিবাসীদের জাগিয়ে তুল্‌ছে দেখে অস্ট্রিয়ার গবর্ণমেণ্ট তাঁদের

ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, তাঁরা মুসোলিনীকে অস্ট্রিয়ান্ সাম্রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করলেন।

কিন্তু তাঁর লেখনীর তেজ অবরুদ্ধ থাক্‌লো না। তিনি হু'একটা সমাজতান্ত্রিক কাগজে লিখতে আরম্ভ করলেন এবং যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাতে লাগলেন। পূর্ব্বে বলেছি রাজনীতি ইতালীর জনসাধারণের একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তারই ফলে একটা বলিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক দল গ'ড়ে উঠেছিল। এদের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ এবং রাষ্ট্রের ভিতর থেকে শ্রেণী-বিভাগ তুলে দেওয়া এবং ধনসাম্য সু-প্রতিষ্ঠিত করা। মুসোলিনী হ'লেন এই দলের প্রধান কর্ণধার এবং দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি।

সমাজতান্ত্রিকদের সেনাপতি হিসেবে তিনি অস্ট্রিযার গবর্ণমেণ্টকে আদেশ করলেন—"ইতালীর দেশ ইতালীকে ফিরিয়ে দাও—আমি বলছি ফিরিযে দাও!" মুসোলিনী বারবার বলেছিলেন, "আজ আমার উপর তোমাদের চাবুক পড়ছে কিন্তু একদিন আমারই কথা তোমাদের শুন্‌তে হবে একান্ত অনুগতের মতো।"

তাঁর এই নির্ভীক ন্যায়পরায়ণতা, অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং আত্মশক্তিতে অখণ্ড বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে ইতালী মুগ্ধ হয়ে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে "অবন্তি" কাগজের সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম ইতালীর গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো। ইতালীর রাজনীতিতে মুসোলিনীর জীবন সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে গেল। এই সময় থেকেই ইতালীর রাজনীতি বলতে বোঝায় মুসোলিনীর জীবনযাত্রা, তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও চিন্তাধারার বিবর্ত্তন।

পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসারের বন্ধনটুকু মুসোলিনীর খ'সে গেল। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি মিলানে চ'লে এলেন। সংবাদপত্রের

সেবার মধ্য দিয়ে তিনি দেশসেবার ব্রত কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়ে পালন করতে লাগলেন। অত্যন্ত দরিদ্রের মতো দিন যাপন করতেন, অথচ তাঁর লেখা পড়বার জন্য লোকে ব্যাকুল হয়ে থাকতো। তিনি সম্পাদনা আরম্ভ করবার পর থেকে "অবন্তি" পত্রিকার দৈনিক বিক্রয় ৩০ হাজার থেকে এক লক্ষে এসে পৌঁছল। এত বড় একটা কাগেজর সম্পাদনা এবং পরিচালনার ভার নিয়েও তিনি তাঁর মাহিনা বাড়াতে চাইতেন না। টাকার কথা বললেই তিনি হেসে বলতেন, "এই তো যথেষ্ট—এর থেকেই পোস্ট অফিসে আমি কিছু কিছু টাকা জমাচ্ছি। বল কি! এর চেয়ে আমার আরও বেশি সচ্ছলতা আবার কবে ছিল?"

লক্ষ লক্ষ ইতালীয় যে অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে তার চেয়ে বেশি সুখ নিজের জন্য তাঁর কল্পনাতীত ছিল। তাঁর আত্মবিশ্বাস তাঁর চিন্তাধারা হয়তো গর্ব্বান্ধ স্বেচ্ছাচারিতা ব'লে বোধ হয় কিন্তু তিনি যখন অকাতরে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়ে শুধু জাতির কথা তাঁর দেশের কথা চিন্তা করতে লাগলেন তখন ইতালীর জনসাধারণ তাদের ত্রাণ-কর্ত্তাকে চিন্‌তে ভুল করেনি।

এদিকে সারা পৃথিবীর আকাশ ঘনঘোর ক'রে "মহাযুদ্ধ" ঘনিয়ে এলো। ১৯১৪ সালে ভগবানের অভিশাপ যেন যুদ্ধের মূর্ত্তিতে দেখা দিল। সমগ্র ইউরোপ শত্রু ও মিত্র হিসেবে ভাগ হয়ে গেল। শুরু হ'ল নৃশংস হত্যা, বীভৎস ধ্বংসলীলা। গ্রামে গ্রামে হাহাকার উঠ্‌লো, শ্মশান হয়ে গেল বহু জনপদ, বহু সুদৃশ্য নগর আর পণ্যশালা।

এই ধ্বংসের মাঝে তালীর জাতীয় জীবনেও শান্তি ছিল না। ইতালীর গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে যোগদান করবেন কিনা ভেবে স্থির করতে পারছিলেন না। এদিকে যুদ্ধারম্ভের পর জার্ম্মানী ইতালীতে তাঁদের

প্রচারকার্য্য চালাতে লাগলো —উদ্দেশ্য, যাতে জার্ম্মানীর প্রতি ইতালীর সহানুভূতি জন্মায়। কিন্তু জার্ম্মানী যখন অবলীলাক্রমে ফ্রান্সের পূর্ব্ব অঞ্চল অধিকার করল তখন জার্ম্মান সৈন্যদলের নৃশংসতার কাহিনী ইতালীর জনমতকে জার্ম্মানীর প্রতিকূলে নিয়ে গেল এবং অবশেষে সর্ব্বপ্রকার মানবতা এবং সততা লঙ্ঘন ক'রে জার্ম্মানী যখন বেলজিয়াম ধ্বংস করতে শুরু ক'রলে তখন একদল চিন্তাশীল ইতালীয় সাম্যবাদী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে উঠে প'ড়ে লাগলেন।

এদিকে অস্ট্রিয়া ইতালীর যে সমস্ত প্রদেশ অধিকার করেছিল, কয়েকজন সাম্যবাদী নেতা দেখলেন যে সেগুলি ফিরিয়ে দেবার এই উপযুক্ত সময়। দান্তে ইতালীর যে সীমারেখা বর্ণনা করেছিলেন প্রত্যেক ইতালীর কাছেই সেটি একমাত্র কাম্য। অতএব ইতালীও যুদ্ধে যোগদান করবে। তাঁরা বললেন, হয় এখন, নয় কখনই না। মুসোলিনী ছিলেন যুদ্ধকামী সাম্যবাদীদের নেতা।

কিন্তু প্রায় সাম্যবাদীদলের সকলেই যুদ্ধে যোগদান করার বিরোধী ছিলেন, তার কারণ তাঁরা একটা সর্ব্বজাতীয় সমন্বয়ে বিশ্বাস করতেন অর্থাৎ তাঁরা বলতেন যে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য তুলে দিলেই পৃথিবীর সমস্ত জাতি এক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে বাঁধা হয়ে যাবে—কোন বিরোধ থাকবে না। তাঁরা সভাসমিতি ক'রে ঘোষণা করলেন যে এ যুদ্ধ করছে কতকগুলি ধনকুবের, তাদের স্বার্থ নিয়ে তারা মারামারি করছে। এ যুদ্ধে ইতালীর জনসাধারণ এবং ইতালীয়ান্ জাতি, যারা শ্রমিক আর চাষী, তারা কেন প্রাণ দেবে? ইতালী এ যুদ্ধে যোগদান করলে অযথা বলক্ষয় হবে।

কিন্তু মুসোলিনী দেখলেন, জাতি হিসেবে সমগ্র পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে হ'লে ইতালীর এই সুবর্ণ-সুযোগ। জাতি হিসেবে

এই যুদ্ধে যদি ইতালী তার আপন শৌর্য্যবলে আপনার স্থান ক'রে নিতে পারে তা'হলে তার দুঃখ ঘুচে যাবে, তার এই অক্ষমতা এই ক্লৈব্য চ'লে যাবে।

সাম্যবাদীদের সঙ্গে তাঁর মতে মিললো না। তিনি দলত্যাগ করলেন, কাজেই 'অবন্তি' পত্রিকা থেকেও তাঁকে বিদায় নিতে হ'ল।

কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি একদল বলিষ্ঠ যুবক নিয়ে একটি দল গঠন করলেন, তাদের নাম হ'ল 'ফ্যাসিস্ত্'। প্রাচীন রোমে ঘাতকরা যে কুঠার ব্যবহার করতো সে কুঠার অনেকগুলি সরু সরু কাঠির মাথায় বসানো থাকতো, সেই কাঠিগুলিকে ফাসিস্ বলা হ'তো। মুসোলিনী বললেন, কুঠারই তাঁর দলের চিহ্ন হবে—উদ্দেশ্য, যুদ্ধ করা।

শুধু দলগঠন করা হ'ল না, মুসোলিনী একখানা কাগজ বা'র করলেন তার নাম হ'ল 'পপোলো-ড্-ইতালীয়া'। এই পত্রিকায় যেদিন প্রথম মুসোলিনী তাঁর প্রবন্ধ লিখলেন সেদিন সারা দেশময় অদ্ভুত উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। সেই দিনই বহু ইতালীয়ান ঠিক করল যে ইতালী নিশ্চয়ই যুদ্ধে যোগদান করবে।

এই পত্রিকায় মুসোলিনী একদিকে দুর্ব্বল গবর্ণমেণ্ট এবং অন্য দিকে সাম্যবাদীদলের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী চালাতে লাগলেন। তাঁর দলে এসে যোগদান করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র বহু সাম্যবাদী যারা ধনসাম্য এবং পৃথিবীর জনসাধারণের সমানাধিকারে বিশ্বাস করতো ; তারা তাদের সে বিশ্বাস ত্যাগ ক'রে ইতালীর গৌরবের জন্য, তাদের মাতৃভূমির গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য মুসোলিনীরই পতাকাতলে ফাসিস্ত্ রূপে এসে দাঁড়ালো। কাগজে মুসোলিনী তাঁর আদেশবাণী ঘোষণা করলেন।

তাঁর বাণীর মধ্যে এইবার কোন যুক্তি ছিল না, কোন অনুরোধ কোন ক'তরতা তাঁর কণ্ঠে প্রকাশ পায়নি। তিনি বললেন, "আমি বলছি তোমরা যুদ্ধে যোগদান করো।" তাঁর আদেশ সেদিন অমান্য করে এমন শক্তি কারুরই ছিল না। সারা ইতালী যুদ্ধে অকস্মাৎ যোগদান করবার জন্য রণসাজে বেরিয়ে এলো। গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হ'য়ে মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হ'লেন।

তখনকার প্রধানমন্ত্রী গিয়োলিত্তি পদত্যাগ করলেন—নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হ'লো—রাজা তৃতীয় ভিক্তর এমানুয়েল জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলেন।

গিযোলিত্তির এই পরাজয়ে মুসোলিনীর জয়ই সূচিত হ'লো। কিন্তু ফ্যাসিস্তির দলপতি এ জয়ে খুব বেশি গর্ব্বিত হ'লেন না; তিনি অগণিত সেনার মধ্যে মার্চ্চ করতে করতে সামান্য সৈনিকরূপে লোম্বার্ডির সীমান্তের গিয়ে উপনীত হ'লেন। শূন্যে অসংখ্য বোমারু ।বমান গর্জ্জন করছে, তার নীচে ট্রেঞ্চের তলায় মুসোলিনীর নূতন জীবন আরম্ভ হ'লো।

যুদ্ধে গিয়ে মুসোলিনীর প্রাণে আশার সঞ্চার হ'ল। তিনি প্রাণে নতুন উদ্দীপনার সাড়া পেলেন। এ যুদ্ধ উনবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ নয়—এ যুদ্ধ গারিবল্ডীর সময়কার, ব্যক্তিগত বীরত্বের কোন মূল্যই এ যুদ্ধে ছিল না। বিপুল সমরায়োজনের মধ্যে মানুষের বুদ্ধি এবং বিজ্ঞান-বলই হ'ল প্রধান সহায়। তবু মুসোলিনী দেখলেন ইতালীয় সৈন্যরা বীরবিক্রমে বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের মধ্যে যুদ্ধ করতে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ভীষণ সমরসজ্জার মধ্যে ইতালীয়দের নির্ভীক কর্ম্মতৎপরতা দেখে মুসোলিনীর আনন্দের সীমা রইল না। তিনি যুদ্ধস্থল থেকে বার বার তাঁর কাগজে তাঁর বাণী পাঠাতে লাগলেন। মহাযুদ্ধে ইতালী

নিঃশেষে আপনাকে দান করলে একদিন বিজয়ী জাতি ব'লে পরিচিত হবে এই আশায়।

কিন্তু ইতালীর দুর্ভাগ্য এলো নানা মূর্ত্তি ধ'রে। যুদ্ধারম্ভের তৃতীয় বর্ষের শেষের দিকে ইতালীর সমগ্র সমরায়োজন ব্যর্থ হ'ল। ইতালী ভেঙে পড়ল। অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পঙ্গু, খঞ্জ, সৈনিকের দল যারা ফিরে এলো তারা তাদের ভাগ্যকে দোষ দিলে; আর যারা যুদ্ধে যায়নি, পরাজিত প্রত্যাগত সৈনিকদের দুর্দ্দশা দেখে তাদের বুক ভেঙে গেল। তারা বল্‌তে লাগলো—কেন এ যুদ্ধ? ইতালীর এতে কী লাভ হবে? শুধু মরণকে আলিঙ্গন ক'রতে কেন যুদ্ধে যাবো?

সাম্যবাদীরা একেই ঘোরতর যুদ্ধবিরোধী ছিল, তারা এই সুযোগে ঘোষণা ক'রলে যে, যুদ্ধে সাহায্য করা মানে ইতালীর শত্রুতা করা। যারা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে তারা নিরুপায় হয়ে প্রায় অনাহারে মরতে লাগলো। গবর্ণমেণ্টের তখন এমন ক্ষমতা নেই যে তাদের জীবনধারণের ব্যবস্থা করেন অথচ সাম্যবাদীদের কাছ থেকে ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সমগ্র ইতালীতে কোথাও কোন উদ্যম কোন উত্তেজনা দেখা গেল না। চারিদিকে শুধু একটা পরাজয়ের গ্লানি, পরস্পরের মধ্যে একদলের বিরুদ্ধে আর এক দলের নিষ্ফল আক্রোশ।

জাতির এবং গবর্ণমেণ্টের এই অক্ষমতা এবং হতাশার সুযোগ নিয়ে সাম্যবাদীরা তাদের কাজে লেগে গেল। তারা বললে, মুসোলিনীর দলের এই দেশাত্মপ্রেমের কোন অর্থ হয় না কেননা, এর দ্বারা ইতালীর জনসাধারণের কল্যাণের কোন পথ তৈরী হবে না, শুধু কতকগুলি ধনিকের অর্থলোলুপতা চরিতার্থ হবে মাত্র। তারা এই সুযোগে তাদের সেই সর্ব্বজাতি-সমন্বয় এবং শ্রেণীবিহীন সমাজ

প্রভৃতির আদর্শ অনুযায়ী জাতিকে তাদের মতবাদে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করতে লাগলো। এমন কি কয়েকটা বড বড কারখানায় শ্রমিকরা তাদের প্ররোচনায় ধর্ম্মঘট করলে। দান্তে যে ইতালীর স্বপ্ন দেখেছিলেন সে ইতালী বুঝি আজ পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এদিকে মুসোলিনী যুদ্ধক্ষেত্রে, ইতালীর সীমান্তে, অসম্ভব সম্ভব করে চ'লেছেন। তিনি যুদ্ধের অভিনব বিজ্ঞান পর্য্যালোচনা করছেন, যুধ্যমান সৈনিকদের উৎসাহ দিচ্ছেন এবং সাম্যবাদী-কবলিত জাতিকে তাঁর বাণী দিয়ে সচেতন ক'রে রাখছেন। একদিকে তাঁর মধুর ব্যবহার, সুমিষ্ট সম্ভাষণ, এবং অপরদিকে তাঁর অসামান্য ধীশক্তি, দুর্নিবার দুর্জ্জয় সাহস এবং অকুণ্ঠ দেশপ্রেম দেখে তাঁর সেনাপতি এবং সহকর্ম্মী সৈনিকেরা মুগ্ধ হয়ে যেতো। একদিন সেনাপতি তাঁকে স্বয়ং ডেকে বললেন, "ইল্ পপোলোর সম্পাদক হিসেবে আপনার জীবনের মূল্য অনেকখানি। আপনাকে আমরা ট্রেঞ্চ থেকে সরিয়ে রাখবো, আপনি লিখবেন এই যুদ্ধের ইতিহাস যা' ইতালীর সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।"

কিন্তু মুসোলিনী জানালেন, সকলকে যুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে নিজে যুদ্ধ থেকে আত্মরক্ষা করা তাঁর রীতিবিরুদ্ধ। যদি মৃত্যু আসেই তাহ'লে তাঁকে তাঁর সহযাত্রীদের সঙ্গেই মৃত্যু বরণ করতে হবে, এবং এই তাঁর নীতি—তাঁর জীবনের আদর্শ।

এর কয়েকদিন পরেই ইতালীর সংবাদপত্রে এক দুঃসংবাদ প্রচারিত হ'ল আর অমনি দলে দলে লোক গীর্জ্জায় গিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলো, "ঈশ্বর আমাদের মুসোলিনীকে নিরাময় করো। তিনি আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসুন।"—একটা বোমা

বিস্ফোরণের ফলে মুসোলিনী গুরুতর আহত হয়েছেন! সর্ব্বাঙ্গে বিয়াল্লিশটি ক্ষত হয়েছিল। তাঁর আহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে সারা ইতালী চিন্তাকুল হয়ে উঠলো। কোথায় গেল সাম্যবাদ, কোথায় গেল দলাদলি—সমগ্র জাতি তাঁর কল্যাণ কামনা করলে। হাসপাতালে স্বয়ং রাজা ভিক্তর এমানুয়েল তাঁকে দেখতে গেলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এতখানি জনপ্রিয়তা খুব সুলভ নয়। দেশকে ভালোবাসা দিয়ে জয় করেছিলেন ব'লেই আজ তিনি তাঁর জাতির একমাত্র অভিভাবক, পিতা এবং ভ্রাতা।

মুসোলিনী যখন হাসপাতালে উত্থান-শক্তি-রহিত অবস্থায় চিকিৎসাধীন হয়ে রয়েছেন তখন সাম্যবাদীরা পূরোদমে তাদের প্রচার-কার্য্য চালাতে লাগলো সেকথা পূর্ব্বেই বলেছি। জাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠা এবং নবজাগরণের যেটুকু উন্মেষ দেখা গিয়েছিল সাম্যবোধ আর দেশাত্ম-প্রেমের সংঘর্ষে তা আবার অন্তর্হিত হ'ল।

তার উপর সীমান্ত থেকে নিত্যনূতন ভযাবহ সংবাদ আসতে লাগলো। ইতালীর পরাজয়ের কাহিনী, অগণিত ইতালীয় সৈনিকের বীভৎস মৃত্যুব সংবাদে শঙ্কাকুল জনসাধারণ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। যুদ্ধ ভীতি তাদের এমনভাবে পেয়ে বসলো যে উত্তরাঞ্চলের লোকেরা দলে দলে ঘরবাড়ি ছেড়ে স্ত্রীপুত্র নিয়ে দক্ষিণ ইতালীতে পালিয়ে আসতে লাগলো। গ্রামের পর গ্রাম দেখতে দেখতে প্রেতপুরীর মতো নির্জ্জন হয়ে গেল।

মুসোলিনী হাসপাতালে রোগশয্যায় শুয়ে ইতালীর এই জাতীয় অধঃপতনের কাহিনী শুন্‌তে পেয়ে গর্জ্জন ক'রে উঠলেন। ইতালীকে সভ্যজাতি-সঙ্ঘের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে হ'লে আজ ইতালীর সমগ্র শক্তি সংগ্রহ ক'রে এই যুদ্ধে ইতালীর যোগদান সার্থক ক'রে তুলতে হবে।

তুচ্ছ দলাদলি আর রাজনীতিক আদর্শের ঊর্দ্ধে উঠে ইতালীকে জাতি হিসেবে বাঁচতে হবে। এই হীন অপমৃত্যু থেকে এই দুঃসহ অবমাননা থেকে ইতালীকে উদ্ধার করতে হ'লে কঠোর হস্তে সমগ্রজাতিকে ভীতি-সঙ্কুল সুসংহত কর্ম্মপদ্ধতির ভিতর দিয়ে মৃত্যুমলিন যুদ্ধযাত্রার পথে টেনে নিয়ে যেতে হবে, তবেই তার হাতাশা ঘুচে যাবে, পঙ্গু ইতালী আবার গিরিলঙ্ঘন করতে সক্ষম হবে—জেগে উঠবে সুস্থ ইতালী, নব-যৌবনবতী বীর-প্রসূ ইতালী!

একদিকে হীনবল শাসকবর্গ ইতালীর জাতীয় সংহতি বজায় রাখতে অক্ষম আর অন্যদিকে সাম্যবাদীরা জাতীয়তার আদর্শ তুচ্ছ ক'রে সাম্যবাদ প্রচার করছে। এরই মধ্যে মুসোলিনী বার বার প্রশ্ন করলেন,—ইতালীর কি এটুকু শক্তি নেই যে সে তার জাতীয়তা, তার নিজস্ব ভাবধারার সূত্রটুকু বজায় রেখে বিনাশের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে?

তখনও তিনি ভালোভাবে সেরে ওঠেন নি। লাঠির উপর ভর ক'রে দুর্ব্বল দেহটাকে টেনে নিয়ে সংবাদপত্র-অফিসে এসে কলম ধরলেন। এইবার কলম হ'ল তাঁর তরবারি—আজও ইতালীর এই তরবারিই অজেয়।

কোন অনুনয় নয় কোন যুক্তিতর্ক নয়,—মুসোলিনী আদেশ করলেন, "তোমরা যুদ্ধে প্রাণ দাও—ইতালীর পুনরুত্থানের জন্য, জাতির মহত্তম কল্যাণের জন্য। বিজয়ী ইতালীকে তার চতুঃসীমার মধ্যে অখণ্ড হয়ে দাঁড়াতে হবে। একবার যখন অগ্রসর হয়েছি ফেরবার পথ বন্ধ, যুদ্ধে যখন নেমেছি জয়লাভ করবোই।" তাঁর কণ্ঠস্বরে কোন দ্বিধা কোন কম্পন নেই। তাঁর আদেশ অলঙ্ঘ্য, তাঁর বাণী সারা ইতালীর অন্তরে প্রদীপ্ত হোমানল জ্বেলে দিলে। তিনি

লিখলেন, "আমরা প্রচণ্ড শীতে নগ্নদেহে শীতকে সহ্য করতে পারি, আমরা পারি অনশনে মৃত্যুবরণ করতে; কিন্তু যুদ্ধথেকে আজ ফিরে আসা মানে শুধু অন্ধকার হিমরাশির মধ্যে ফিরে আসা নয়, খাদ্যবিহীন দুর্ভিক্ষের মধ্যে ফিরে আসা নয়,—আজ ফিরে আসা মানে নিদারুণ অপমানে নিজের মধ্যে নিজেকে হীন ও হেয় ক'রে রাখা। এই অপমান আমরা সইব না। এর লজ্জা আমাদের মাটির তলায় মিশিয়ে দেবে। আমরা যুদ্ধে নেমেছি, আমরা জয়লাভ করবো—সে জয় অবশ্যম্ভাবী।"

মুসোলিনীর বাণী সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো এবং দেখতে দেখতে জাতির মধ্যে আবার যুদ্ধ-জয়-স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠলো। চারিদিকে সভাসমিতি হ'তে লাগলো—সব জায়গাতেই এক কথা—আমরা যুদ্ধ চাই—জয় চাই। দলে দলে লোক যুদ্ধে যোগদান করলেন। ইতালীর গবর্ণমেণ্টের পেছনে যখন সমগ্র জাতি এসে দাঁড়ালো তখন তাঁরা দ্বিগুণ তেজে অসম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে চল্লেন। মুসোলিনী দেখলেন তাঁর আদেশ ব্যর্থ হ'ল না, ইতালীর জাগরণ অসম্ভব নয়।

মুসোলিনীর লেখায় যুদ্ধ-নেতারা নতুন প্রাণশক্তি লাভ করলে। সম্মিলিত জাতির সম্মতি পেয়ে সেনাপতিগণ সীমান্তে সমগ্রশক্তি সংহত করলেন। ফলে বিশ্বলোক বিস্মিত হয়ে দেখলে যে, ইতালীর সৈন্যদের কাছে বার বার অস্ট্রিয়ার বিপুল যুদ্ধ-সমারোহ ব্যর্থ হচ্ছে —একটির পর একটি যুদ্ধে ইতালী জয়লাভ করছে। এই জয়লাভের অত্যুগ্র উন্মাদনা সীমান্ত থেকে ইতালীর গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। দান্তের ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হ'ল—ত্রিয়েস্ত্‌ এবং ট্রেনতো প্রদেশ ইতালীর অন্তর্ভুক্ত হ'ল—ইতালী জয়লাভ করলে। ১৯১৮

সালের ১১ই নভেম্বর যেদিন যুদ্ধ থেমে গেল সেদিন ইতালী বিজয়ী জাতিরূপে সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

ইতালী জয়লাভ করলে বটে কিন্তু সে-জয়ের বিনিময়ে তার প্রাণভাণ্ডার অনেকখানি শূন্য ক'রে দিতে হ'ল। মহাযুদ্ধে ইতালীর পক্ষ থেকে ৬ লক্ষ ৫২ হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেছে, ৪ লক্ষ ৫০ হাজার লোক বিকলাঙ্গ পঙ্গু হয়ে ফিরে এসেছে এবং ১০ লক্ষ লোক আহত হয়েছে! একটি জাতি এর চেয়ে আর কী দিতে পারে। এই লক্ষ লক্ষ দেহমুক্ত আত্মার কাতর আবেদন যেন মুসোলিনীর কানে বাজতে লাগলো—এই অগণিত বিকলাঙ্গ জীবন্মৃত অসহায় লোকের আর্ত্তকণ্ঠ মুসোলিনীর মনে এক অদ্ভুত রূপকের সৃষ্টি করলে—সে-রূপক তাঁর স্বপ্ন, নব জাগ্রত বলিষ্ঠ ইতালী। তাঁর মনে একটিমাত্র চিন্তা—এই লক্ষ লক্ষ অমূল্য জীবনের মূল্য দিয়ে যে-বিজয় কেনা হ'ল, সর্ব্বস্বপণ ক'রে তাকে রক্ষা করতেই হবে।

এদিকে যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের অবস্থা ভয়াবহ হ'ল। সৈন্যরা ফিরে এসে দেখলে তাদের জন্য খাদ্য নেই, জীবিকা-অর্জ্জনের কোন উপায় নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য অচল, জিনিসপত্রের দাম চারগুণ বেড়ে গেছে এবং গবর্ণমেণ্ট আগেকার চেয়ে অনেক দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। তাদের সংসার এখনও আছে কিন্তু সংসার তারা পালন করবে কেমন করে? ইতালীর কোন কোন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা

সুবিধা বুঝে সাম্যবাদীরা কল-কারখানা, মিউনিসিপ্যালিটি সব দখল ক'রে নিতে লাগ্‌লো এবং গবর্ণমেণ্টকে পঙ্গু ক'রে দেবার জন্য চারিদিকে ধর্ম্মঘট করতে লাগ্‌লো। গবর্ণমেণ্টও নিরুপায়—তাঁদের এমন শক্তি নেই এদের দমন করেন এবং সাহসও নেই সাম্যবাদীদের

কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ ক'রে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। চারিদিকে রীতিমত অরাজকতা দেখা গেল।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যারা ফিরে এল, জয়লাভ ক'রে ফিরে এল, তাদের কেউ অভিবাদন করলে না, বরং সাম্যবাদীরা তাদের স্বজাতিদ্রোহী ব'লে ঘোষণা করতে লাগ্‌লো। ইতালীর দুরবস্থা তখন এমনই চরম হয়ে উঠেছে। মুসোলিনী লিখেছেন, "বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখি, জাতি হিসেবে রাষ্ট্র হিসেবে ইতালীর শেষ রাত্রির প্রদোষান্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।"

কিন্তু মুসোলিনী হতাশ হ'লেন না। তিনি তাঁর ফ্যাসিস্ত্ দল গঠন করলেন। ফ্যাসিস্ শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই বলেছি। আজ মাত্র কয়েকজন যুবককে নিয়ে এই দল গ'ড়ে তোলা হ'ল। এই দলের প্রত্যেকেই সেই রোমক ঘাতকের খড়্গের মতো, প্রত্যেকের মাথায় একটি মাত্র দীপ্যমান কৃপাণ—সে কৃপাণ জাতীয়তা রক্ষা করবার জন্য অবিচলিত নিঃসংশয়ে শত্রুনিধনে চির-উদ্যত। এই দলের আদর্শ হ'ল জাতীয়তা বজায় রাখা, নিয়মনিষ্ঠা এবং কর্ম্মময় জীবনযাত্রায় অকুণ্ঠচিত্তে দলপতির আদেশ পালন করা।

ফ্যাসিস্ত্ দল গ'ড়ে উঠলো বটে কিন্তু সাম্যবাদীরা অনেকখানি এগিয়ে চল্‌লো। গ্রামে গ্রামে লোকে তাদের কথা না বুঝলেও তাদের যুদ্ধ-বিরোধী মতবাদটা তাদের কল্যাণের পক্ষে অনুকূল ব'লে মনে করলে। ফলে, মুসোলিনীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে ১৯১৯ সালের ১৬ই নবেম্বর যে পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন হ'ল তাতে ফ্যাসিস্ত্ দল সাম্যবাদীদের কাছে পরাজিত হ'ল। বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ ক'রে তারা পার্লামেণ্ট দখল করলে। ক্ষমতা হাতে পেয়ে তারা তার অপব্যবহার করতে লাগলো। কিন্তু সংঘর্ষ আর ষড়যন্ত্রের

মধ্যে মুসোলিনীর দল প্রভূত শক্তিসঞ্চয় করলে; সাম্যবাদীরা কোলাহল করতে করতে একদিন নিঃশেষ হয়ে গেল।

মুসোলিনী কোন কোলাহল না ক'রে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে তাঁর দলের শাখা স্থাপিত করতে লাগলেন এবং ধীর চিত্তে প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে তাঁর দলের আদর্শ এই ক'টি লাইনে ব্যক্ত করলেন:

১। জাতিকে তার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন রাখা।

২। যে কোন আন্দোলন—তার আদর্শ যাই হোক—জাতির সংহতি এবং সমগ্রতাকে ব্যাহত করবে, তাকে প্রাণ দিয়েও বাধা দিতে হবে।

৩। গবর্ণমেণ্টর অক্ষমতা, সাম্যবাদী এবং অন্যান্য দলের অসংযত প্রচারের ফলে জাতির মনে যে সন্দেহ, যে হতাশা, যে বিচ্ছিন্নতা জেগেছে তাকে বিদূরিত করা।

ফ্যাসিস্ত্ দলের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ১৯১৯ সালের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে। সেই অধিবেশনে ১৫০ জন সভ্য মাত্র উপস্থিত ছিলেন এবং দুদিন তর্ক-বিতর্ক আর আলোচনা করার পর মাত্র ৫৪ জন লোক একটি কাগজে স্বাক্ষর ক'রে দলবদ্ধভাবে কাজ করবার শপথ গ্রহণ করেন। এই দলের নাম ছিল, Fasci di Combat timento."

কিন্তু ফ্যাসিস্ত্ দল প্রবল-পরাক্রান্ত হয়ে উঠলো। ফ্যাসিস্ত্ দলের লোকদের পরিধানে ছিল কালো শার্ট এবং সাম্যবাদীরা পরতো লাল শার্ট। পথেঘাটে এই লাল শার্ট এবং কালো শার্টে সংঘর্ষ বাধতে লাগলো। একদিকে 'লা অবন্তি' এবং অন্যদিকে ফ্যাসিস্ত্দের 'ইল্ পপোলা' পরস্পর পরস্পরকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু সাম্যবাদীরা এত বেশি দম্ভপ্রকাশ এবং মিথ্যাচার

করতে লাগলো যে, তাদের সমর্থকের সংখ্যা ক'মে আসতে লাগলো।

এদিকে মন্ত্রীরা মুসোলিনীর জনপ্রিয়তা এবং সংগঠন-শক্তিতে ভীত হয়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করলেন। এতে প্রতিবাদ এলো বন্যার মতো, জনসাধারণ প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রায় মরীয়া হ'য়ে মুসোলিনীকে জেলে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বন্ধ ক'রে রাখলেন।

সেই প্রকোষ্ঠের পাহারায় যে দু'জন প্রহরী নিযুক্ত ছিল তাদের মুখ দেখে মুসোলিনীর মনে হ'ল তারা একান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কেবল কর্ত্তব্যের খাতিরে যেন তাঁকে পাহারা দিচ্ছে, অথচ তাদের পাহারায় কোন শৈথিল্য ছিল না।

মুসোলিনী যেদিন ইতালীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'লেন সেদিন তাদের ডেকে পাঠালেন। তারা তো ভয়েই অস্থির! বুঝি-বা তাদের প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু মুসোলিনী বললেন, "সেদিন তোমাদের ব্যবহার এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। সেইজন্য আজ থেকে তোমাদের আমার দেহরক্ষী নিযুক্ত করলাম।"

কারাগার থেকে মুসোলিনী যেদিন বেরিয়ে এলেন সেদিন প্রায় সমগ্রজাতি তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের আশ্বাস-বাণী তাদের অভিনন্দন তাদের সমবেত হর্ষধ্বনি তিনি যেন নিজ কানে শুনতে পেলেন। তিনি স্থির করলেন, জোর ক'রে ইতালীর শাসনভার ফ্যাসিস্ত্ দলের অধিকারে আনতে হবে। ১৯২২ সালের ২৮শে মার্চ্চ তিনি ঘোষণা করলেন যে—তাঁর ফ্যাসিস্তিই ইতালী শাসন করবে, তাঁরা জোর ক'রে রোম অধিকার ক'রে শাসনভার গ্রহণ করবেন।

তিন লক্ষ ফ্যাসিস্তি সৈন্য নিয়ে দুর্ব্বার গতিতে মুসোলিনী রোমের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

যুদ্ধ অনিবার্য্য দেখে প্রধান মন্ত্রী ফ্যাক্টো রাজার কাছে সামরিক আইন জারী করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু রাজা ভিক্টর এমানুয়েল তাঁকে বললেন, "আজ থেকে তোমার মন্ত্রিমণ্ডলীকে আমি বরখাস্ত করলুম। মুসোলিনীই ইতালীর প্রধান মন্ত্রী হ'লেন।"

মুসোলিনী পথে যখন সমরায়োজন করতে ব্যাপৃত তখন তিনি রাজার কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম পেলেন—সে টেলিগ্রামে রাজা তাঁকে ইতালীর প্রধানমন্ত্রী-রূপে বরণ ক'রে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বিনা রক্তপাতে ইতালীর প্রধান মন্ত্রী-রূপে মুসোলিনী রোমে প্রবেশ করলেন, পিছনে তাঁর তিন লক্ষ বীর সেনানী—ইতালীর জাতীয়তার মূর্ত্ত প্রতীক! জগতের ইতিহাসে এই ঘটনাটি মার্চ্চ অব্ রোম নামে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই দিনটিকে স্মরণ করবার জন্য ইতালীর রাজা ২৮শে অক্টোবর জাতীয় আনন্দের দিন ব'লে ঘোষণা করেন।

প্রধান মন্ত্রী-রূপে তিনি সর্ব্বপ্রথম পার্লামেন্ট প্রথা আইন ক'রে তুলে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন—ইতালীতে একটিমাত্র রাজনীতিক দল থাকবে, সে দল ফ্যাসিস্তি এবং তারাই ইতালীর শাসনকার্য্য পরিচালনা করবে। মুসোলিনী ইতালীর আভ্যন্তরীণ উন্নতির দিকে মন দিলেন। বণিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষ তিনি আইনত দণ্ডনীয় ব'লে ঘোষণা করলেন এবং ফ্যাসিস্তি দলের মূল নীতি তিনি ব্যক্ত করলেন এই কয়েকটি কথায়: কোন প্রাণবান্ এবং প্রাণধর্ম্মী রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন একটা অলঙ্ঘ্য চিরস্থির এবং সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শবাদ থাকতে পারে না। ইতালীর জাতীয় জীবনের প্রয়োজন অনুসারেই ফ্যাসিজম্-এর নীতি প্রবর্ত্তিত হবে।

ফ্যাসিজম্-এর এই অমোঘ দেশাত্মবোধের আদর্শই আজ ইতালীকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিসঙ্ঘের মাঝখানে স্থান ক'রে দিয়েছে। ইতালীর জনসাধারণকে আজ আর ধনসাম্যের জন্য শাসকদের কাছে আবেদন করতে হয় না—সেখানে শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য 'লেবার চার্টার'—আবার রাষ্ট্রের তথা জাতির সমগ্রতা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সর্ব্বনাশা পররাষ্ট্র-লোলুপতা, যার জন্য কামান আর বোমাবর্ষী বিমানবাহিনীর সাহায্যে মুসোলিনী নিরীহ আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা হরণ করলেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনই ফ্যাসিস্তির সকলের বড় প্রয়োজন।

সাম্যবাদীরা ধর্ম্মের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং আদর্শের কোন সম্বন্ধ স্বীকার করে না, কিন্তু সকলের বড় বিস্ময় এই যে আজকের নিরীশ্বর বাদ এবং যন্ত্র-সভ্যতার যুগেও ইতালীতে মুসোলিনী ধর্ম্মকে রাষ্ট্র-ব্যবহারের মূল কথা ব'লে প্রচার করলেন এবং ইতালীর জাতীয় জীবন তিনি এক কঠোর নৈতিক অনুশাসনের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করলেন। আইন ক'রে তিনি সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির প্রশ্রয় দান নিষিদ্ধ করলেন। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনত দণ্ডনীয় হ'ল এবং সাধারণ পানশালা প্রভৃতির প্রসার একেবারে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।

এমনি ক'রে নির্ব্বীর্য্য পঙ্গু ইতালীর যৌবন এল ফিরে। ফ্যাসিস্তির আসল কাজ ছিল বৃদ্ধ ইতালীর বিরুদ্ধে নবীন, যৌবনোদ্দীপ্ত ইতালীর একটা তীব্র প্রতিবাদ—বলবতী অস্বীকৃতি। যা কিছু রক্তহীন, মৃত্যু-মলিন, তাকেই নির্ম্মমভাবে ঠেলে ফেলে দিয়ে ফ্যাসিস্তি তাকেই প্রতিষ্ঠা করলে যা' রক্তিম, যা' প্রাণময়, যা স্ফূর্ত্তিমান, যা' জীবন্ত।

ফ্যাসিস্ত্‌দের কাছে তাদের দেশের মাটির চেয়ে পবিত্র কিছু নেই, সুন্দর কিছু নেই, প্রিয় কিছু নেই। সেই মাটির অমর্য্যাদা হয় এমন

কোন আদর্শ—তা' যতই কেন বিশ্বের মঙ্গলকামী হোক্ না—তারা কিছুতেই সইবে না। খড়্গ-কৃপাণ হাতে ধ'রে তারা তাদের দেশের মাটির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে। ইতালীর মর্য্যাদার কাছে কোন ত্যাগই ত্যাগ নয়, কোন দুঃখকেই তারা দুঃখ বলে স্বীকার করে না। ফ্যাসিজম্‌এর অর্থ তাই আবেগমধুর শক্তিধর্ম্ম কিংবা যুব-ধর্ম্ম বলা যায়।

মুসোলিনীর আদর্শ জগতের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করবে কিনা, তিনি বর্ত্তমান জগতের মহামানব কিনা, এ সমস্ত প্রশ্ন না তুলেও এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বর্ত্তমান জগতে যে সব জাতি আজও পতিত, আজও লাঞ্ছিত, আজও তন্দ্রাচ্ছন্ন আলস্যে সুষুপ্ত তাদের কাছে তাঁর দেশাত্মবোধ তাঁর কর্ম্মশক্তির বিকাশ আদর্শের স্থান অধিকার ক'রে থাক্‌বে। সর্ব্বোপরি যুব-শক্তিকে সংহত ক'রে নবযৌবনের উদ্দাম তরঙ্গাঘাতের দ্বারা তিনি তাঁর জাতিকে যে ভাবে জাগিয়ে তুলেছেন তাতে সারা জগতের নবীনের দল তাঁকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

ডোবিয়ার সেই ছোট ছেলেটি—যে নদীর ধারে ব'সে ব'সে ইতালীর অতীত গৌরবের কথা ভাবতো আর স্বপ্ন দেখতো জগতের সম্রাজ্ঞী রোমের—আজ ইতালীর ভাস্কর তার মূর্ত্তি গড়ছে, ইতালীর কবি তার জয়গান করছে, আর তারই বাণী অনাগত যুগের ইতালীকে প্রাণবান ক'রে রাখবে।

হিট্‌লার

আজ সারা জগতে যে লোকটির জন্ম কারুর ভয়ের অন্ত নেই, নানা দেশে নানা জাতি যাকে প্রতিমুহূর্ত্তে ধিক্কার দিচ্ছে—কেউ বল্‌ছে দানব, কেউ বল্‌ছে পিশাচ, কেউ বা আরও ঘৃণাসূচক বিশেষণ দিচ্ছে যার নামের আগে—সে হের এ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলার। আজ ইনি বর্ত্তমান জার্ম্মানীর রাষ্ট্রনায়ক, শাসক এবং ভাগ্যনিয়ন্তা।

জার্ম্মানজাতির বলবীর্য্য এই হিটলারের জন্ম আজ জগতের আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিটলার অস্ট্রিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া নামে দুটি দেশ জার্ম্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, গ্রীস প্রভৃতি ইউরোপের প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ দেশ-গুলিকে জার্ম্মানীর অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছেন। এমনই অদ্ভুত শক্তিশালী এই লোকটি, এমনই বিশ্বগ্রাসী তাঁর পৌরুষ।

কিন্তু এই বিরাট পুরুষটি কোন রাজবংশীয় বা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি এবং সকলের বড় বিস্ময় এই যে তাঁর বংশের কোন বীরত্বের কাহিনীও কখনো শোনা যায় নি। জার্ম্মানী এবং অস্ট্রিয়ার সীমান্তদেশে ইন্‌ নদীর ধারে ব্রোনাউ নামে একটি ছোট সহরে নিতান্ত এক অখ্যাত দরিদ্র পরিবারে হিটলারের জন্ম হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সেই অখ্যাত দিবসে কেউ কল্পনা করেনি যে সেইদিনকার একটি সদ্যোজাত শিশুই একদিন সমগ্র জগতের শান্তি হরণ করবে, সংহারমূর্ত্তিতে পৃথিবীর বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

ছোটবেলাতেই হিটলারের পিতার মৃত্যু হয়। কাজেই লেখাপড়া শেখা তাঁর ভাগ্যে আর ঘটে উঠলো না। তারপর সংসারের যা' কিছু পুঁজি ছিল মায়ের অসুখে তা' সমস্তই নিঃশেষ হয়ে গেল। মা ছাড়া

তাঁর আপনার কেউ ছিল না। পিতৃহীন ব'লে যে পেন্সনটুকু পেতেন তাতে সংসার চলা কঠিন। অতএব বালক হিট্‌লার গোটা কয়েক জামাকাপড় পুঁট্‌লি বেঁধে সোজা ভিয়েনা সহরের দিকে যাত্রা করলেন। ভাগ্য অন্বেষণ করতে নয়, ভাগ্য সৃষ্টি করতে। কাঁধে তাঁর সেই পুঁট্‌লিটি, আর অন্তরে বিপুল বাসনা—যেমন ক'রে হোক্ একটা কিছু করতেই হবে।

কেবল একটা কাজে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল সেটা হচ্ছে রাজ-দপ্তরে চাকরি করা—এইটি তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন।

ভিয়েনাতে এসে তাঁকে কাজ জোগাড় করতে কম বেগ পেতে হ'ল না। শোনা যায় যে এক সময় তিনি নাকি দেওয়ালে রঙ করার কাজ করতেন এবং এই কাজে তাঁর দক্ষতাও ছিল। কিন্তু ভিয়েনাতে এসে তিনি প্রথম রাজনীতিতে দীক্ষালাভ করেন। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তাঁকে নানা লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হ'ত, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে তাঁকে দিন কাটাতে হ'ত তাদেরই একজনের মতো হয়ে, এবং এমনি ক'রে সমাজের এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার অনেক ত্রুটি তাঁর চোখে পড়লো। তাঁর জীবনযাত্রার পথে তিনি রাজনীতি শিক্ষা করলেন তাঁরই আপন জীবনের বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে।

ভিয়েনায় এসে তাঁর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তিনি দেখলেন একদিকে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের বিপুল ঐশ্বর্য্য-সম্ভার; রাজসভাকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র সাম্রাজ্যের ধনবান্ রাজপুরুষের দল বিত্তগর্ব্বে স্ফীত হয়ে বিলাসব্যসনে দিন কাটাচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন উৎসবের মধ্য দিয়ে, আর অন্য দিকে অগণিত বেকার যুবক আর দরিদ্র শ্রমিকের দল পথের কুকুরের মতো নিরন্ন অবস্থায়, প্রচণ্ড শীতে বস্ত্রহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐ

বিরাট বিত্ত-গৌরব এবং এই সীমাহীন দারিদ্র্য আর অনশন পাশাপাশি ভিয়েনা সহরে যেন সাজানো রয়েছে। একই সহরে মানুষ পাশাপাশি বাস করছে অথচ তাদের মাঝে এতখানি পার্থক্য, এতখানি বিভেদ! এই নিঃসীম অসামঞ্জস্য দেখে হিট্‌লারের মনে রাজনৈতিক চিন্তা জেগে ওঠে এবং মুসোলিনীর মতো তিনিও সাম্যবাদীদলে যোগদান করেন।

শুধু সাম্যবাদ নয়, ভিয়েনায় থাক্‌তে থাক্‌তে অস্ট্রিয়ান্ সাম্রাজ্যের এই স্বর্ণ-প্রভা, এই ঐশ্বর্য্য-স্ফীতির অন্তরালে যে ফাঁকি ছিল, সাম্রাজ্যের ভিত্তি যে শিথিল হয়ে আস্‌ছিল, সে সমস্তই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। অস্ট্রিয়ান্ সাম্রাজ্যের নানা গলদ দেখে হিট্‌লারের মন জার্ম্মানীর দিকে ফিরে দাঁড়ালো এবং তিনি সেইদিনই উপলব্ধি করেছিলেন যে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের ধ্বংসের মধ্যেই বিরাট জার্ম্মান সাম্রাজ্যের বীজ উপ্ত আছে। সেদিন থেকে হিট্‌লার স্বপ্ন দেখেছেন জার্ম্মান-অস্ট্রিয়ার মিলিত সাম্রাজ্য!

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন সুদৃঢ় এবং সুসমঞ্জস সমাজ-ব্যবস্থা। অস্ট্রিয়ায় হিটলারকে যে জীবন-যুদ্ধে লিপ্ত থাক্‌তে হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে তিনি একথা পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে, "সমাজের সত্যিকার উপকার করতে হ'লে তার আংশিক উন্নতি সাধন করলে কিছুই হবে না, হিতসাধনী কর্ম্মপদ্ধতির দ্বারা সমাজের সেবা করা হয় না। সমাজের প্রকৃত সেবা করতে হ'লে, তাকে বলিষ্ঠ এবং উন্নত করতে হ'লে সমাজের মধ্যে যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা এবং আদর্শ বহুদিন ধ'রে শিকড় নামিয়ে ব'সে আছে সেইগুলিকে আগে নির্ম্মূল করতে হবে, সংস্কৃতিগত এবং অর্থনৈতিক যা' কিছু ভ্রান্তি আছে তাকেই উচ্ছেদ করতে হবে।"

ভিয়েনায় তাঁর এই যে শিক্ষালাভ হয়েছিল, তাঁর জীবনে তার মূল্য অনেকখানি। তাঁর এই শিক্ষার জন্যই তিনি সেইদিন থেকে জার্ম্মান সাম্রাজ্যের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে দিয়েছিলেন। প্রতিদিন তিনি ঐতিহাসিক গবেষক ছাত্রের মতো জার্ম্মানীর খবর, সেখানকার দৈনন্দিন ঘটনাবলী সাগ্রহে অনুধাবন করতেন। জার্ম্মানীর জন্য সেইদিন থেকেই তাঁর চিন্তার অবধি নেই। এদিকে অস্ট্রিয়ান্ সাম্রাজ্যের পতনও আসন্ন হয়ে এলো। অস্ট্রিয়ার রাজশক্তি দিন দিন যত ক্ষীণতর হয়ে আস্‌তে লাগলো ততই হিট্‌লারের জার্ম্মান রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যেন সত্যে পরিণত হ'তে লাগলো।

১৯১৪ সালে বিগত মহাসমরের সূত্রপাত হ'ল। সমগ্র ইয়োরোপ যেন কামানের শব্দে আর বারুদের বিষাক্ত ধূমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। হিট্‌লার তখন ব্যাভেরিয়াতে; তিনি অস্ট্রিয়ার সম্রাটের কাছে আবেদন করলেন, সৈনিকরূপে তিনি যুদ্ধে যোগদান করতে চান। সম্মতি পেয়ে তিনি সৈনিকরূপে যুদ্ধে যোগদান করলেন। যুদ্ধে হিট্‌লারের যেন নেশা আছে, যুদ্ধের মধ্যদিয়েই তিনি শান্তির কল্পনা করেন। মহাযুদ্ধে জার্ম্মানজাতির নানা সঙ্কট হিট্‌লার নিজের চোখে দেখবার সুযোগ পেলেন।

সৈনিক হিসাবে তাঁর দক্ষতা সামান্য ছিল না। সামান্য সৈনিক হ'লেও তাঁর বীরত্বের কথা রাজধানীতে এসে পৌঁছল। এই সময় ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হ'লেন। এ্যাম্বুলেনস্ ট্রেনে তাঁকে বার্লিনে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু সেরে উঠে তিনি আবার যুদ্ধে যোগদান করলেন। এবার কয়েকদিনের মধ্যে তিনি গুরুতররূপে আহত হ'লেন, তাঁকে মিউনিকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

মিউনিকে যখন তিনি আরোগ্য লাভ করলেন তখন পুনরায় যুদ্ধে যোগদান করবার জন্য গেলেন। কিন্তু এবার তাঁকে রক্ষিত সেনা-নিবেশে কাজ দেওয়া হ'ল। এই সময় মিউনিকে সেনানিবেশে একটা ছোট বিদ্রোহ হয় এবং এই বিদ্রোহের অবসান হ'লে হিট্‌লারকে তার রিপোর্ট লিখতে দেওয়া হয় এবং সৈন্যদের সুনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করার জন্য যে সমিতি স্থাপিত হয় তাতেও হিট্‌লারকে যোগদান করতে হয়। এই সূত্রে বহু জাতীয়তাবাদী এবং সাম্যবাদী কর্ম্মীর সঙ্গে হিট্‌লারের পরিচয় ঘটে। তাদের সঙ্গে হিট্‌লার এক নূতন শ্রেণীবিহীন সমিতি স্থাপনার কথা আলোচনা করতেন। জাতির ধনসম্পদ যা মুষ্টিমেয় ধনিকের করায়ত্ত হয়ে রয়েছে তাকেই কেমন ক'রে রাষ্ট্রের তথা জাতির হিতসাধনের জন্য ব্যয় করা যায়, কেমন ক'রে ধনিকের কবল থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে দেশের সম্পদ দেশের কাজে লাগানো যায় এই ছিল তাঁদের সকলের বড় চিন্তা।

হিট্‌লার যে-সমস্ত মনীষীর কাছ থেকে প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গটফ্রায়েড্ ফেডর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অধ্যাপকটির ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনে হিট্‌লার প্রথম নতুন দল গঠন করা এবং কোন্ পথে সে দলকে চালিত করবেন সেই কর্ম্মপদ্ধতি স্থির ক'রে ফেলেন। এই সময় German Workers' Party নামে এক রাজনৈতিক সমিতির রিপোর্ট নেবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে ঐ সমিতির অধিবেশনে প্রেরণ করেন।

ঐ সভায় এক ভদ্রলোক, সম্ভবত ঐ সভার সভাপতি, জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে এক অদ্ভুত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। হিট্‌লার রিপোর্টার হ'লেও তৎক্ষণাৎ ঐ বক্তার প্রতিবাদ করেন এবং তাঁর ধারণা

যে কতদূর ভ্রান্ত সেকথা সভাকে যুক্তি দিয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় বুঝিয়ে দেন। হিট্‌লারের জীবনে এই প্রথম বক্তৃতা!

কয়েকদিন পরেই ঐ পার্টির সভ্যগণ হিট্‌লারকেও তাঁদের সভ্য ক'রে নেন।

কিছুদিন পরে অস্ট্রিয়াতে ফিরে এসে তাঁর অন্তরে যে দারুণ বহ্নি প্রজ্বলিত হ'ল তার দাহ বোধ করি আজও নিঃশেষিত হয়নি। অস্ট্রিয়ায় এবং জার্মানীতে য়িহুদি ধনী ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিকদের আচরণ দেখে ঘৃণায় তাঁর সারা মন যেন বিষাক্ত হয়ে গেল। এই যে তিনি য়িহুদিদের ঘৃণা করতে শিখলেন তার বিষময় ফল সারা য়িহুদিজাতিকে আজও ভোগ করতে হচ্ছে। জার্মানজাতির প্রতিনিধি হিসেবে য়িহুদিদেব উপর প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা তাঁর আজও তৃপ্ত হয়নি। জার্মান জাতির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য লোকে যখন হাজারে হাজারে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মদান করছিল তখন এই য়িহুদি ব্যবসায়ীর দল সেই আত্মদানের সুযোগ নিয়ে মহাযুদ্ধের দারুণ অর্থাভাবের মধ্যে নিজের টাকার থলি ভ'রে তুলছিল। শুধু এইখানেই য়িহুদিদের কাজ শেষ হয়নি, হিট্‌লার দেখতে পেলেন যে, যে সাম্যবাদী দল জার্মানী ও অস্ট্রিয়ায় সাম্যবাদ ও শান্তির বাণী প্রচার করছিল সে সমস্ত শুধু য়িহুদি ব্যবসায়ী আর রাজনৈতিকদের একটা চক্রান্ত। তারা সাম্যবাদ প্রচার করছে বা করাচ্ছে শুধু যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন ক'রে তুলে যাতে তাদের ব্যবসায়ের সুবিধা হয় এই জন্য। আজও হিট্‌লার বিশ্বাস করেন যে, মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীতে যে সাম্যবাদী আন্দোলন হয় তা' শুধু ঐ য়িহুদি বণিক্‌দের বাণিজ্য-চক্রান্ত মাত্র।

সাম্যবাদীদলের হোতারা য়িহুদিদের অর্থে পুষ্ট, তারা পরোক্ষভাবে ইহুদিদের স্বার্থ রক্ষা করতেই ব্যস্ত। হিট্‌লার স্থির করলেন যে, এক শক্তিশালী বিপ্লবী জাতীয় দল গঠন ক'রে তিনি স্বজাতি এবং স্বদেশকে য়িহুদি বণিক এবং সাম্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। এই দল গঠনে তাঁর প্রধান সহায় হ'লেন মিউনিকের এক অধ্যাপক এবং কয়েকজন যুবকমাত্র, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সৈনিক। তাঁর দলটির নাম হল Nationalist Socialist German Workers' Party. সকল রকম বাইরের আদর্শবাদ থেকে এবং বাইরের আন্দোলনের অভিঘাত থেকে জার্ম্মান জাতীয়তাকে রক্ষা করবার জন্য এই দলের উৎপত্তি হ'ল। এই দলই বর্ত্তমান Nazi দল, 'নাৎসী' শব্দটি জার্ম্মান জাতীয়তা-বোধক শব্দের সংক্ষেপ।

এই দলের উদ্দেশ্য হ'ল—প্রথমত যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে জার্ম্মান জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে অর্থাৎ নাজীদলের এই জাতীয়তার আদর্শের দ্বারা তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি জার্ম্মান শ্রমিকের সমস্ত পরিশ্রম জার্ম্মান জাতির উন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়।

দ্বিতীয়ত, জাতীয়তার আদর্শ শুধু একটা উদ্দেশ্য হয়ে থাক্‌লেই চলবে না, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে কাজ ক'রে যেতে হবে এবং একমাত্র দৃঢ় সঙ্কল্প ও শক্তির দ্বারাই যে জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা যায় এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, তাঁরা স্থির করলেন শুধু নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কাজ ক'রে গেলেই চল্‌বে না, তাঁদের বিরোধী দলগুলিকে সমূলে বিনষ্ট করাও তাঁদের অন্যতম কর্ত্তব্য হবে।

এছাড়া তাঁরা শ্রেণী-বিভেদ সম্বন্ধে স্থির করলেন যে, অনুন্নত শ্রেণীকে তাদের ন্যায্যপ্রাপ্য দান করতে হ'লে, তাদের সমানাধিকার দিতে গেলে, রাশিয়ার মতো উন্নত শ্রেণীদের উচ্ছেদ সাধন ক'রে শ্রেণী-বিহীন রাষ্ট্র গ'ড়ে তোলবার কল্পনা করলে চল্‌বে না, অনুন্নত শ্রেণীকে উন্নত ক'রে তুল্‌তে হবে, সমানাধিকার লাভ করার জন্য তারা বল সঞ্চয় ক'রে সংগ্রাম ক'রে সমানাধিকার লাভ করবে, তারা উন্নত হয়ে উঠবে তাদের আপন চিত্তবল ও সংহতিশক্তির বলে।

হিট্‌লারের এই নবগঠিত দলটির প্রথম অধিবেশন বসে বুর্গেনক্রাউর এক পানশালায়। প্রথম অধিবেশনে মাত্র ১১১ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তার পরের অধিবেশনে বিরুদ্ধ-দলের নানা অপচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে হিট্‌লার এক বিরাট জনতার সাম্‌নে বক্তৃতা দিলেন। প্রথমে ২,০০০ লোক সভায় উপস্থিত ছিল, পরে আরও লোক এসে সভায় যোগদান করলে। এই সভায় হিট্‌লার তাঁর নাৎসী নীতির মূলকথা ব্যাখ্যা করেন। তিনি ঐ বিপুল জনতাকে বুঝিয়ে দেন যে জাতীয়তার আদর্শকে লোকের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে এই জাতীয় দলকে শক্তিশালী ক'রে তুল্‌তে হবে এবং জাতীয় দলের সভ্যগণ তাঁদের আদর্শের সম্মান রক্ষা করতে বলপ্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হবে না।

হিট্‌লার তাঁর দলের একমাত্র উদ্যোক্তা ছিলেন বল্‌লেই হয়। সাম্যবাদীদল এবং কম্যুনিস্ট আদর্শবাদী দলের সঙ্গে তাঁর বার বার শক্তিপরীক্ষা হয়ে গেল। নানা স্থানে সভা-সমিতি করতে গিয়ে বাধা এলো বন্যার মতো, কিন্তু হিট্‌লার বিশ্বাস করেন যে, "শক্তিমান পুরুষের শক্তি তখনই দুর্জ্জয় হয় যখন তাকে রক্ষা করবার মতো কেউ তার পাশে থাকে না—সে দাঁড়িয়ে থাকে একা।"

একদিন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে হিট্‌লার সোৎসাহে শোভাযাত্রা ক'রে তাঁদের নব-উদ্ভাবিত জাতীয়তা প্রচার করছেন লাড্‌উইগ্‌ক্রুকের পথে পথে, এমন সময় রাজসৈন্যদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বাধলো। রাজসৈন্যরা তাঁদের শোভাযাত্রা বন্ধ করতে বল্‌লে, কিন্তু হিট্‌লার সে কথায় কান দিলেন না। অবশেষে তিন বার সাবধান করার পর তারা গুলি ছুঁড়লে। সঙ্গে সঙ্গে হিট্‌লারের প্রায় ১৬।১৭ জন সঙ্গী সেইখানেই মারা গেলেন। হিট্‌লারের পার্শ্বচর গ্যয়রিঙ, আজ যিনি নাজী কর্ম্মীরূপে জগদ্বিখ্যাত, তিনিও ঐ দলে ছিলেন। তবে তিনি আহত হ'লেন মাত্র। হিট্‌লার আত্মগোপন করলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁকে কয়েক দিনের মধ্যেই কারারুদ্ধ করলেন—বিচারে তাঁর চার বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হ'ল।

চার বৎসর পরে যখন হিট্‌লার জেল থেকে বেরিয়ে এলেন তখন জার্ম্মানীর অবস্থা তাঁর প্রচারকার্য্যের অনুকূল ব'লে বোধ হল। তখন মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে—সমগ্র জগতে জার্ম্মানজাতি পরাজিত ব'লে ঘোষিত হয়েছে। একে পরাজিত তার উপর যে-সকল সর্ত্তে জার্ম্মানীকে সন্ধি করতে হ'ল তার প্রতিটি অক্ষরে যেন জার্ম্মানজাতির নিদারুণ অপমান নিহিত ছিল। এই সন্ধির বিনিময়ে জার্ম্মানজাতি শুধু নিজেকে খর্ব্ব করেনি, জাতি হিসেবে সমস্ত জগতের চোখে সে হীন হয়ে গেল। প্রত্যেক জার্ম্মান যেন জাতির এই লাঞ্ছনার জ্বালা অনুভব করছে। হিট্‌লার যেন ঠিক এইটিই চেয়েছিলেন। তিনি কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নূতন উদ্যমে জাতীয়তার বাণী প্রচার করতে লাগলেন। জার্ম্মান জাতির এই অবমানিত আত্ম-চেতনার বিরাট হতাশা এবং অসন্তোষের মাঝে জার্ম্মানীর একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে জাতীয়তার বাণী ছড়িয়ে পড়ল।

হিট্‌লার প্রচার করলেন, জার্ম্মান জাতিকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন ধরাতলে আধিপত্য করতে, জাতি হিসেবে জার্ম্মানজাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, দেশ হিসেবে তাদের দেশই সেরা দেশ এবং বীরত্বে জার্ম্মান জাতির সমকক্ষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই ; শুধু য়িহুদিদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় আজ তারা পরাজিত, য়িহুদিরাই শত্রুর কাছে তাদের প্রতারিত করেছে—নইলে তারা অপরাজেয়।

হিট্‌লারের মুখে এসব কথা শুন্‌তে জার্ম্মান মাত্রেরই ভালো লাগ্‌লো—আত্মগ্লানির অবসাদের মাঝে আত্মশ্লাঘা তাদের যেন প্রাণ দান করলে। তাঁর প্রচারকার্য্যের ফলে লহমায় যেন সারা জার্ম্মানীতে সাড়া প'ড়ে গেল। দেখতে দেখতে তাঁর দলের সভ্য-সংখ্যা বাড়তে লাগ্‌লো—নাজীদল জার্ম্মানীর এক শক্তিশালী দলে পরিণত হ'ল।

এ ছাড়া হিট্‌লার আর একটি দল গ'ড়ে তোলেন তার নাম হ'ল Storm Detachment বা ঝটিকা-বাহিনী। পৃথিবীতে এই দলটির দ্বিতীয় নেই। হিট্‌লারের জাতীয়তার বাণীর মধ্যে একটি কথা ছিল সেটি হচ্ছে হিংসার কথা, অর্থাৎ জাতীয়তার আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে (প্রয়োজন হ'লে) বলপ্রয়োগ করতেও দ্বিধা করলে চল্‌বে না। তাঁর এই ঝটিকা-বাহিনীটি তাঁর এই দিকটা দেখতেন। সাম্যবাদীদের বিধ্বস্ত করতে এই ঝটিকা-বাহিনীই ছিল তাঁর প্রধান সহায়। সারা জার্ম্মানীর বুকে এ ঝটিকা-বাহিনী এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। জাতীয়তার আদর্শ অনেক স্থলে শুধু প্রাণভয়ে লোকে মেনে নিলে। কতকগুলি নির্ভীক অসমসাহসী কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত যুবককে নিয়ে এই ঝটিকা-বাহিনী গ'ড়ে ওঠে। আজও এর প্রতাপে জার্ম্মানীতে স্বাধীন মত প্রকাশ করবার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত লোকে

হারিয়েছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব ক'রেই হিট্‌লার জাতীয়তার গর্ব্ব বজায় রেখেছেন।

যাই হোক্‌, ঝটিকা-বাহিনীর জন্যই হোক্‌ বা জাতীয়তার জাদু-মন্ত্রেই হোক ১৯৩০ সালে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হ'ল তাতে নাজীদলের ১০৭ জন সদস্য রাষ্ট্রসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হ'লেন এবং সামান্য একজন নগণ্য সৈনিক হিট্‌লার হ'লেন তাঁর দলের নেতা— জার্ম্মানীর রাজনীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা।

হিট্‌লারের জাতীয়দলের জনপ্রিয়তার আরও কারণ ছিল। বাহিরের নানা রাজনৈতিক দলের অপচেষ্টা, বিরোধিতা এবং মহাযুদ্ধের ভীষণ প্রতিক্রিয়ার ফলে জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা একেবারে চরম অবস্থায় এসে পৌঁছলো। গবর্ণমেণ্টের ঋণের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। তার উপর জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যের কোন সুবিধাই সন্ধির বিনিময়ে লাভ হয়নি। সকলের বড় সমস্যা হ'ল বেকার সমস্যা। বেকারদের সংখ্যা ক্রমে অসম্ভবরূপে বেড়ে যেতে লাগলো। কেমন ক'রে যে এতগুলি লোকের জীবিকার উপায় হবে এই হ'ল গবর্ণমেণ্ট এবং জননায়কদের একমাত্র চিন্তা।

এই সময় হিট্‌লার প্রচার করলেন যে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের লজ্জাকর দুর্ব্বলতা এবং অক্ষমতাই জার্ম্মানজাতির এই দুরবস্থার জন্য দায়ী! গবর্ণমেণ্টকে পরিবর্ত্তিত করতে হবে, নতুন ক'রে রাষ্ট্র গ'ড়ে তুলতে হবে।

মহাযুদ্ধের অবসানে ভার্সাইয়ে মিত্রশক্তি ও জার্ম্মানীর মধ্যে যে সন্ধি হয় তাতে জার্ম্মানীকে নানা চুক্তিতে আবদ্ধ করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্‌ এবং মিত্রশক্তিগণ সম্মিলিত ভাবে জার্ম্মানীকে সর্ব্বপ্রকার হেয়তা স্বীকার করতে বাধ্য করলেন।

জার্ম্মানীকে হীন ক'রে রাখার সুযোগ পেয়ে এই বিজয়ী শক্তিনিচয় জয়গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠেছিলেন বটে কিন্তু ঐ সকল চুক্তির মধ্যে আজকের মহাযুদ্ধের বীজ উপ্ত ছিল। জার্ম্মানীর এই অপমানের সুযোগ নিয়ে হিট্লার তাঁর জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করলেন—জাতির এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য যখন জার্ম্মানগণ পাগল তখনই হিট্লারের বাণী তাদের আহ্বান করলে—ক্ষুধিত, অবমানিত সংক্ষুব্ধ জার্ম্মানজাতি হিট্লারের নাজী-পতাকার তলে সমবেত হ'ল।

জাতির এই মানসিক অবস্থা হিট্লারের বুঝে নিতে দেরী হয়নি, জার্ম্মানীর মনস্তত্ত্ব তিনি আবাল্য অনুধাবন করেছেন। ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্ম্মানীর উপনিবেশ ছিনিয়ে নেওয়া হ'ল, ক্ষতিপূরণের বিপুল বোঝা চাপান হ'ল এবং জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট যাতে সামরিক শক্তি বর্দ্ধিত করতে না পারেন এই সম্মিলিত মিত্রশক্তি তার জন্য কড়া আদেশ জারী ক'রে দিলেন। জার্ম্মানীর সামরিক শক্তির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হ'ল অলঙ্ঘ্য প্রভুত্বের অধিকারে। চুক্তির এই সমস্ত সর্ত্তগুলির মধ্যেই প্রতিহিংসার ভাব ছিল। হিট্লার জার্ম্মান জাতিকে মিত্রশক্তির এই প্রতিহিংসার প্রবৃত্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি এই প্রতিহিংসার প্রতিশোধ নেবার জন্য সেই মহাযুদ্ধ-বিধ্বস্ত, হিংস্র জার্ম্মানীকে হিংস্রতর জিঘাংসায় উদ্বুদ্ধ করলেন। মিত্রশক্তির প্রতিহিংসায় সমগ্র জার্ম্মানজাতির অন্তরে প্রতিহিংসার লেলিহান অগ্নিশিখা জ্ব'লে উঠলো। নাজীদলের এই বিশ্বজয়ী শক্তির মূলে বোধ করি প্রতিহিংসাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, জাতীয়তার ছদ্মবেশে হিংসা জার্ম্মানজাতিকে পাশবিক শক্তির মাদকতায় উত্তেজিত ক'রে তুলেছে।

হিট্‌লার তাঁর ভাষার জাদুমন্ত্রে ধীরে ধীরে সকলকে সম্মোহিত ক'রে ফেল্‌লেন। তিনি জার্ম্মানীকে বুঝিয়ে দিলেন যে, মহাযুদ্ধের পরাজয় পরাজয়ই নয়। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের জন্য জার্ম্মানজাতি প্রস্তুত ছিল না তবু যেরূপ অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে তারা সম্মিলিত মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে এসেছে তার তুলনা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। এই ত্যাগ, এই বীরত্ববৈভব, এই অগণিত জীবনক্ষয় —এ সমস্তই কী ব্যর্থ হবে? জার্ম্মান জাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এর কি কোন মূল্যই নেই?

সম্মোহিত, উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত জার্ম্মানী উত্তর দিলে "কখনো না, জার্ম্মান বীরগণ রক্তের অক্ষরে যে শপথ গ্রহণ করেছে রক্ত দিয়ে সে শপথ পালন করতে হবে—সার্থক করতে হবে জার্ম্মানীর স্বজাতি-অভিমান। ভার্সাই চুক্তির অপমান তারা সইবে না।" পরাজিত জার্ম্মানী জাতীয়তার সুখস্বপ্নে আপনার সকল ক্ষতি সর্ব্বপ্রকার দৈন্য নিমেষে বিস্মৃত হ'ল।

হিট্‌লারের দল শক্তিশালী হয়ে উঠলো, তাঁর জনপ্রিয়তা গবর্ণমেন্টের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু গবর্ণমেন্ট হিটলারের হাতে দেশের শাসনভার ছেড়ে দিতে কিছুতেই রাজী হ'লেন না। একটা সামান্য অশিক্ষিত সৈনিককে তাঁরা কেমন ক'রে এতবড় একটা জাতির শুভাশুভের দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন?

হিট্‌লার নিজের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি শাসন-পরিষদের বাইরে থেকেই নাজী প্রচারকার্য্য চালাতে লাগলেন। নাজীদলের প্রচারকার্য্যের ভার তিনি নিজে গ্রহণ করলেন। হিট্‌লারের এই প্রচারকার্য্য-প্রণালী সারা জগতের বিস্ময়। কেমন ক'রে কিসের মধ্য দিয়ে যে এরা প্রচার করে জগতের লোকে সে কথা চিন্তা

করতেই পারে না। হিট্‌লার বিশ্বাস করেন অজ্ঞ জনসাধারণকে জাগাতে হ'লে সর্ব্বপ্রকারে প্রচার করতে হবে। তিনি বলেন "প্রচার-কার্য্যের ফলে জনসাধারণকে দলে টান্‌তে হবে, তারপর কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং দলের গঠনতান্ত্রিক শৃঙ্খলার লৌহপাশে দলের প্রত্যেককে এক একজন বৃহত্তম কর্ম্মবীর ক'রে তুল্‌তে হবে।" এ ছাড়া তিনি বলেন "প্রচারকার্য্যে আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, দেশের প্রচলিত রীতিনীতি ও জীবনধারাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এবং অচল ক'রে দিতে হবে এই নবীন আদর্শবাদের সংঘাতে।"

সারা জগতের রাষ্ট্রনায়কগণ হিটলারের এই প্রচারকার্য্যকে ভয় করেন সকলের চেয়ে বেশি।

এই প্রচারকার্য্যের ফলে জার্ম্মানীর প্রচলিত গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় এসে পৌঁছলো। আজ এক মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়, তাঁরা পদত্যাগ করেন, আবার কাল নতুন মন্ত্রিসভার নাম ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন দলের সংঘাতে এবং পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক আদর্শবাদে জার্ম্মানীর রাষ্ট্রিক জীবন সংক্ষুব্ধ এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

এই রকম দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়ে ১৯৩২ সালের নির্ব্বাচনের ফলে যখন নাজীরা বিপুল সংখ্যাধিক্যে শাসন-সভায় প্রবেশ লাভ করলে তখন তারা আশা করেছিল যে, তদানীন্তন চ্যান্‌সেলর ফন্ প্যাপেন হিট্‌লারকেই চ্যান্‌সেলর পদ ছেড়ে দিয়ে তাঁরই হাতে দেশের সম্পূর্ণ শাসনভার তুলে দেবেন। কিন্তু ফন্ প্যাপেন হিট্‌লারকে ভাইস্ চ্যান্‌সেলরের পদ গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। হিট্‌লার এ পদ প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তাঁর দলের লোকেরা প্যাপেনের এই আমন্ত্রণকে নাজীদলের অপমান ব'লে মনে করলে।

প্যাপেনের এই আমন্ত্রণের ফলে রাজনৈতিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ালো। নাজীদল হিট্‌লারকে অতিমানব ব'লে মনে করতো এবং তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো, জার্ম্মানীকে এই সঙ্কট থেকে, এই বিপদ-সঙ্কুল আবর্ত্ত থেকে উদ্ধার করতে হিটলার ছাড়া আর কেউ সক্ষম হবে না, একমাত্র হিটলারই জার্ম্মানীর ত্রাণকর্ত্তা!

নাজীরা দাবী করলে যে প্যাপেন পদত্যাগ করুন এবং হিটলারের হাতে শাসনভার ছেড়ে দেওয়া হোক্।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নাজীদলকে বিশ্বাস করতে পারেননি। এদিকে শাসন-ব্যাপার একেবারে অচল হয়ে এলো। নাজীরা এই দলাদলি এবং অচল অবস্থার সুযোগে প্রচার করতে লাগলো—হিটলারের হাতে শাসনভার ছেড়ে না দিলে জার্ম্মানীর মুক্তি অসম্ভব, এ অরাজকতা দূর করতে পারেন একমাত্র হিটলার।

বলপ্রয়োগেও নাজীরা তাদের প্রচারকার্য্য চালাতে লাগলো। যেখানে লোকে মুখের কথায় নাজীদের কথা না মেনে নিতো সেখানে সেই ঝটিকাবাহিনীর প্রতাপে ঝড় বয়ে যেতো। অবাধে নাজীদল গুণ্ডামি চালিয়ে যেতে লাগলো। ঝটিকাবাহিনীর গুণ্ডামির ভয়ে বিপক্ষদলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল। গবর্ণমেণ্ট শিথিল হয়ে এল, জার্ম্মানীর সমগ্র শক্তি ক্রমশ হিটলারের করতলগত হ'ল। ১৯৩৩ সালে অকস্মাৎ হিটলার ঝটিকার বেগে শাসনযন্ত্র দখল করলেন, সৈনিক হিটলার হ'লেন চ্যানসেলর হিটলার!

এম্‌নি ক'রে শাসনযন্ত্র দখল ক'রে হিটলার নিজেকে জার্ম্মানীর ডিক্টেটর ব'লে ঘোষণা করলেন। মুসোলিনীর মতো জোর ক'রে তিনি বিরুদ্ধ দলের কণ্ঠরোধ করলেন—নাজী-বিরুদ্ধ সংবাদপত্র বন্ধ ক'রে

দিলেন। নাজী আদর্শবাদ যারা মান্‌তে চাইল না তাদের নির্ব্বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জেলে পুরে রাখলেন। প্রথম যৌবন থেকেই তাঁর বিশ্বাস ছিল যে য়িহুদিরাই ষড়যন্ত্র ক'রে নিজেদের স্বার্থের জন্য জার্ম্মানীকে বার বার বিপন্ন করেছে, তাদের জন্যই জার্ম্মানী হৃত-সর্ব্বস্ব হয়ে মহাযুদ্ধে হীন পরাজয় স্বীকার করেছে, এবং তাদেরই প্ররোচনায়, তাদেরই অর্থে পুষ্ট হয়ে সাম্যবাদীদল জার্ম্মানীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, জাতীয়তার অন্তরায় ঘটিয়েছে। শাসন-যন্ত্র অধিকার ক'রেই হিটলার য়িহুদি-পীড়ন আরম্ভ করলেন। এই হ'ল তাঁর জাতীয়তার প্রথম নিদর্শন।

জার্ম্মান জাতির সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়েই তিনি ঘোষণা করলেন, "জার্ম্মানজাতি সমগ্র পৃথিবীর অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার আগে তাদের উচিত তাদের সেই সমস্ত শত্রুদের নির্ম্মমভাবে শাস্তি দেওয়া যারা শত্রুর কাছে তাদের বিক্রী ক'রে দিয়েছে, তাদের প্রতারিত করেছে!" এই শত্রুরা হচ্ছে জার্ম্মান য়িহুদি!

কয়েক বৎসরের মধ্যে হিট্‌লার জার্ম্মানী য়িহুদি-শূন্য করলেন। বহু নিরীহ য়িহুদি কুকুরের মতো বিতাড়িত হ'ল—গৃহহারা বহু নরনারীর ক্রন্দনরোলে জার্ম্মানীর আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল। কিন্তু হিট্‌লার পাষাণ হয়ে রইলেন। অপমানের আশঙ্কায় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও জার্ম্মানী পরিত্যাগ করলেন এবং অস্ট্রিয়া জার্ম্মান-অধিকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ বৃদ্ধ ফ্রয়েড্ মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ইংলণ্ডে এসে আশ্রয় নিলেন।

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে হিট্‌লার মহারুদ্রের মতো বীরদর্পে ইয়োরোপের মানচিত্র পরিবর্ত্তনে লেগে গেলেন। জার্ম্মানীর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়াই তাঁর একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়ালো। মহাযুদ্ধের পর রুঢ় অঞ্চল

জার্মানীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। হিট্‌লার ভার্সাই চুক্তির সর্ত্ত অবজ্ঞাভরে তুচ্ছ ক'রে ঐ রুঢ় অঞ্চল পুনরায় দখল ক'রে নিলেন। সংখ্যালঘু জার্মান সম্প্রদায়ের নিপীড়নের অজুহাতে তিনি অস্ট্রিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করলেন। তার পর বৃটেন ও অন্যান্য শান্তিকামী রাষ্ট্রের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে তিনি পোল্যাণ্ড অধিকার করেছেন।

আজ পিছনে তাঁর বিরাট জার্মানজাতি এবং সহায় বিপুল বিচিত্র রণসম্ভার। সেই গর্ব্বে স্ফীত হয়ে তিনি নরওয়ে, ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করেছেন এবং ফরাসীকে হীন সর্ত্তে যুদ্ধ-বিরতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমগ্র ফরাসীজাতিকে নিজের আজ্ঞাবহ ক'রে রেখেছেন। সর্ব্বপ্রকার মানবতা এবং রণনীতি লঙ্ঘন ক'রে তিনি ইংলণ্ডের নিরীহ জনসাধারণকে আশ্রয়হীন করেছেন। তারপর বিপুল বাহিনীর প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে অতর্কিত ভাবে অকস্মাৎ আক্রমণ করেছেন রাশিয়া। রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর এই যুদ্ধে আজ সমগ্র জগৎ জার্ম্মান জাতির প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে। বহু জাতির মৌন চোখের জলে তাঁর যাত্রাপথ পঙ্কিল হয়ে উঠেছে, বিশ্বের শান্তিহন্তারূপে আজ জগদ্‌বাসীর কাছে অভিশাপ তাঁর একমাত্র প্রাপ্য।

জার্ম্মান জাতিকে তিনি ভালোবেসেছেন, এই জাতিকে তিনি প্রাচীন আর্য্যজাতিসম্ভূত শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে জগতের শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে চান; কিন্তু তাঁর এই অত্যুগ্র দেশপ্রেম, এই জাতীয়তা সীমা অতিক্রম করেছে—জার্ম্মানজাতি তাঁর জাতীয়তার মোহে মানব-সভ্যতার মর্ম্মস্থলে আঘাত করেছে। ইয়োরোপ তাঁর পদভারে মূর্চ্ছাতুর, সারা জগৎ তাঁর দানবীয় মত্ততায় শঙ্কিত, ত্রস্ত, বিপর্য্যস্ত। জার্ম্মানীর নবজাগরণের মূলে যেমন হিট্‌লার তেমনি তাঁরই উন্মত্ত হিংস্রতায় জার্ম্মানী তার নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আন্‌ছে।

মহাত্মা গান্ধী

পৃথিবীতে অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তি দুর্গত দরিদ্র দেশবাসীদের উন্নতি বিধান করতে, তাদের মানুষ ক'রে তুলতে নিজেদের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করছেন। এঁদের কেউ কারুর চেয়ে ছোট নন্— আদর্শগত বৈষম্য ও বিরোধ থাকলেও হৃদয়ের দিক থেকে এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব দেশবাসীর একান্ত আপনার জন। বর্ত্তমান যুগে নানাদেশে এইরকম স্বদেশবৎসল জননায়কদের অভ্যুত্থান হয়েছে। কিন্তু এঁদের মধ্যে কে সেই জাতীয়তার পুরোহিত যিনি সংসারের সর্ব্বপ্রকার সম্পদকে সভয়ে পরিত্যাগ ক'রে জীবনের প্রতি পদে বিপদকে বরণ করে নিয়েছেন, নিজের দেশকে উন্নত ও স্বাধীন করতে গিয়ে নিজেকে বলি দিয়েছেন সকলের পুরোভাগে ? কে সেই সন্ন্যাসী যিনি মহৈশ্বর্য্যের মধ্যেও কোনদিন লেশমাত্র গর্ব্ববোধ করেননি এবং মহাদৈন্যেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি যাঁর মাথা নত করাতে পারেনি ? কে সেই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যিনি নিজের দেশের হিত-সাধন করতে গিয়ে অন্য কোন দেশের এতটুকু অমঙ্গল কামনা করেন নি ? আমরা জানি তাঁর নামটি ভারতবর্ষের সর্ব্বজনবন্দনীয় নাম— মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পোরবন্দর বা সমুদ্রপুরে ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। মহাত্মাজীর পিতামহ এবং পিতা উভয়েই পোরবন্দর রাজ্যের মন্ত্রিত্ব করতেন।

মহাত্মাজীর পিতার নাম করমচাঁদ গান্ধী। ইনিও সত্যাশ্রয়ী বীর এবং তেজস্বী ছিলেন।

মাতা পুতলীবাঈও ছিলেন সাধ্বী, ধর্মভীরু এবং দয়াবতী রমণী। তিনি আজীবন চাতুর্মাস নামে এক সুকঠোর ব্রত পালন করতেন। এই ব্রতের বিধি অনুসারে একবেলা আহার করতে হয়, কিন্তু পুতলী-বাঈ প্রায়ই একদিন অন্তর উপবাস করতেন। একবার তিনি ব্রত নিয়েছিলেন যে সূর্য্য-নারায়ণ দর্শন না ক'রে আহার করবেন না। অশ্রান্ত বর্ষায় মেঘমেদুর আকাশে সূর্য্যোদয় দুর্লভ হ'ত এবং পর পর অনেকদিন তাঁকে অনাহারে থাকতে হ'ত। এ ছাড়া অনাথ আতুরদের তিনি সন্তানস্নেহে যথাসাধ্য পালন করতেন। তাঁর সাংসারিক বুদ্ধির জন্য রাণীরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। পুতলীবাঈ স্বামীর দরবার-সংক্রান্ত কাজকর্মেও পরামর্শ দিতেন।

এইরকম এক আদর্শ পরিবারে আদর্শ পিতামাতার কোলে মহাত্মাজীর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। শৈশবেই "হরিশ্চন্দ্র" ও "শ্রবণের" কাহিনী শুনে সত্যের প্রতি, ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মায়। বাল্যকালে স্কুলে ছাত্রাবস্থায় কুসংসর্গে প'ড়ে একবার তিনি মাংসাহার করেন। তাঁর পরিবারে মাংসাহার পাপ ব'লে মনে করা হ'ত। অল্প কয়েকদিন পরে মহাত্মাজী নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তিনি যা কিছু গর্হিত কাজ করেছিলেন সমস্ত তাঁর পিতার গোচর ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে মহাত্মাজী কত বাল্যকাল থেকে অসত্যকে পরিহার করতে শিখেছিলেন।

কাথিয়াবাড় ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে মহাত্মাজী ব্যারিস্টারী পরীক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। অনেক চিন্তার পর ব্যারিস্টারী পড়া স্থির হয়। কেননা ব্যারিস্টারী পাশ করলে দেওয়ানী পদ সহজেই পাওয়া যায়।

বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়। কিন্তু তাতে তিনি সংকল্পচ্যুত হ'লেন না। সমুদ্রযাত্রার জন্য জাতিচ্যুতির অন্ধ নিয়মকে মহাত্মাজী শত লাঞ্ছনাতেও সমর্থন করলেন না। তাঁর ধর্ম-ভীরু মাতা পুরোহিতের কাছে তাঁকে দাঁড় করিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে বল্লেন "মদ্য ও মাংস স্পর্শ করবো না। নিজের স্ত্রী ব্যতীত জগতের সমস্ত রমণীকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধার চোখে দেখবো।" জননীর সম্মুখে পুরোহিতের সম্মুখে মহাত্মাজী এই শপথ গ্রহণ করলেন। জননীর আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত হয়ে ১৮৮৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর মহাত্মাজী ভারতীয় সমুদ্রোপকূল পরিত্যাগ করলেন।

বিলাতে বহুবার তাঁকে জীবনের কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয়। বিলাতের সমস্ত আচার-বিচারই আমাদের দেশীয় আদর্শ মতে নীতি-বিগর্হিত। সেখানে যেটা সাধারণ নিয়ম সেটাকে ভারতীয় যুবকরা সাহেবিয়ানার মোহে সাধারণভাবে গ্রহণ করে এবং নানাপ্রকার দুর্নীতিকে অন্তরে অন্তরে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু এই হিন্দু যুবকটি সাহেবিয়ানার মোহে কোনদিন নিজের শপথের কথা, সত্য-পালনের কথা বিস্মৃত হননি। মহাত্মাজী সাহেবিয়ানা শিখেছিলেন বেশভূষায় চলনে বলনে। কিন্তু আহার-বিহারে তিনি কঠোর শুচিতা রক্ষা করতেন। নিরামিষ হোটেল তখন বিলাতে দুর্ল্লভ ছিল এবং তিনি যে পরিবারে থাকতেন তাঁরা প্রায়ই তাঁর গোঁড়ামির জন্য ভর্ৎসনা করতেন কিন্তু মহাত্মাজী নীরবে উপবাস করতেন তবু আমিষ খাদ্য গ্রহণ করতেন না। বিলাতে নানাপ্রকার প্রলোভন এবং নৈতিক অধঃপতন থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রে মহাত্মাজী তাঁর চরিত্রকে সুদৃঢ় ক'রে তোলেন। তাঁর অন্তরে যে ঋষি-গান্ধী ছিলেন তিনিই যুবক-গান্ধীকে অহরহ রক্ষা করতেন।

১৮৯১ সালের ১০ই জুন গান্ধী ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন্ এবং তার কয়েকদিন পরেই ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। দেশে পদার্পণ ক'রেই তিনি তাঁর মাতৃবিয়োগের সংবাদ পেলেন। বিলাতযাত্রার পূর্ব্বেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে।

স্বদেশে ফিরে তাঁকে আরও কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হ'ল। তাঁর স্বদেশবাসীদের মধ্যে একদল তাঁকে জাতিতে গ্রহণ করলে এবং আর একদল তাঁকে জাতিচ্যুত করলে। যারা তাঁকে জাতিচ্যুত করলে তাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করা বা কলহ করা দূরে থাকুক্ গান্ধী তাঁদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধই রক্ষা ক'রে চল্লেন! তাঁর শান্ত অপ্রতিরোধ-নীতি অপরপক্ষকে দুর্ব্বল ক'রে দিল। গান্ধীকে বেশিদিন জাতিচ্যুত হয়ে থাকতে হয়নি।

আইন পাশ করেছেন কিন্তু ওকালতী করার মতো বিদ্যা তখন তাঁর ছিল না। ব্যারিস্টারী করতে গিয়ে গান্ধী একথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলেন যে ব্যারিস্টারী পাশ করা সহজ কিন্তু ব্যারিস্টারী করা সহজ নয়। বোম্বাই হাইকোর্টের বড় বড ব্যবহারাজীবীদের অদ্ভুত অসাধারণ আইনজ্ঞান ও বাগ্মিতার অতিরঞ্জিত কাহিনী শুনে গান্ধী আরও ভীত হ'লেন।

এই হতাশার মধ্যে তাঁর ভাই-এর চেষ্টায় একটি ৩০৲ টাকার ব্রীফ্ পেলেন। প্রতি কেসের জন্য দালালকে কমিশন দিতে হ'ত। এই প্রথা তাঁর অত্যন্ত নীচ ব'লে মনে হ'ল। তিনি কমিশন দিতে অস্বীকার করলেন। কেস্ খুব সোজা—একদিনেই শেষ হবার কথা। কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে জেরা করতে আরম্ভ ক'রেই তাঁর সর্ব্বদেহ কাঁপতে লাগল, মাথা ঘুরতে শুরু হ'ল, চোখের সম্মুখে যেন অন্ধকার দেখলেন। কোনমতে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে গান্ধী আদালত থেকে

বেরিয়ে পড়লেন। এই লাজুক, ভীরুস্বভাব স্বল্পভাষী যুবকটিই আজ ভারতবর্ষের জাতীয় যজ্ঞের উদারকণ্ঠ মন্ত্র-উদ্‌গাতা। পরবর্ত্তী জীবনের বহু সাধনা বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গান্ধী এই সকল দুর্ব্বলতা জয় করেছেন। আজ তাঁর চেয়ে শক্তিমান্ পুরুষ জগতে দুর্ল্লভ।

এর পরে কিছুদিন রাজকোটে গান্ধী এক অফিস খুলে দিলেন। অফিসে শুধু আরজি লেখার কাজ হ'ত। এই সময় দাদা আবদুল্লা এবং শেঠ আবদুল করিম নামে পোরবন্দরে দুই ধনী বণিক্ ছিলেন। তাঁদের দক্ষিণ আফ্রিকায় মস্ত কারবার ছিল। ঐ কারবার সংক্রান্ত ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁদের মোকদ্দমা চল্‌ছিল। তাঁরা বহু উকিল ব্যারিস্টার নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে তাঁদের ভালো ইংরেজী জানা একটি লোক নেবার দরকার হ'ল। তাঁরা গান্ধীকে নিযুক্ত করলেন। গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি দিলেন। এই নগণ্য ভারতীয় যুবকটির দক্ষিণ আফ্রিকায় অবতরণ সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলা যায়। এইখানেই গান্ধী তাঁর শান্ত অপ্রতিরোধ-নীতি ও অহিংসা-মন্ত্রের সফলতা স্বয়ং উপলব্ধি করেন এবং বিশ্বজনের কাছে প্রচার করেন।

নাতালে ও দক্ষিণ আফ্রিকার নানা প্রদেশে হাজার হাজার প্রবাসী ভারতীয় নানা জীবিকা উপলক্ষে বাস করত। ব্যবসায়, বাণিজ্যে ও কৃষিপণ্যে তাদের দান দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। কিন্তু তারা কালা-আদ্‌মি ব'লে গোরা বা শ্বেতাঙ্গরা তাদের অহরহ নানা নির্য্যাতন করতো। এমন কি, তারা ভারতীয়দের মানুষ ব'লে গণ্য করতো না। শ্বেতাঙ্গদের হাতে এই নিরুপায় অসহায় মূক ভারতীয় নরনারীর নির্য্যাতনের কাহিনী যেমনি মর্ম্মন্তুদ, তেমনি ঘৃণিত। তাদের মধ্যে ধনী ব্যক্তির অভাব ছিল না, অভাব ছিল শুধু

প্রতিবাদ করার মতো, প্রতিরোধ করার মতো সাহস ও শক্তির। চাক্‌রি করতে গিয়ে গান্ধীর মধ্যে সেই মহামানবের উন্মেষ হ'ল যিনি অবমানিত জাতির উদ্ধার সাধন করেন, রুদ্রতেজে ভস্মীভূত করেন পৃথিবীর যত কিছু গ্লানি, যত কিছু হিংসা-বিদ্বেষ।

দাদ্ আবছুল্লার কাজে তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার নানা স্থানে ভ্রমণ করতে হ'ত। পথে পথে তিনি ভারতীয়দের দুর্দ্দশা দেখতে লাগলেন। ভারতীয়রা রেলগাড়ীতে উচ্চশ্রেণীতে ভ্রমণ করতে পারে না, রাস্তায় ফুটপাথে তাদের চলার অধিকার নেই ; এম্‌নি আরও নানাবিধ সামান্য নাগরিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। প্রতি পদে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার ও জুলুম সহ্য করতে হয় অথচ কেউ কোন প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করে না। তারা যেন মেনে নিয়েছে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটা নগণ্য শ্বেতাঙ্গের প্রতিটি কার্য্যের পিছনে বিরাট শাসন-শক্তির সমর্থন আছে।

গান্ধী নিজেও অনেক অত্যাচর সহ্য করতেন। একবার তিনি টিকেট কিনে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ট্রান্সভাল যাচ্ছেন, পথে একটা স্টেশনে একজন শ্বেতাঙ্গ তাঁকে কাম্‌রা থেকে নামিয়ে দিলে। সকলের চেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, সেই স্টেশনের রেল-কর্ম্মচারী ঐ শ্বেতাঙ্গটির কার্য্য শুধু সমর্থন করলে না, সিপাই ডেকে গান্ধীকে নামিয়ে দিলে। দারুণ শীতের রাত্রে গান্ধী সেই স্টেশনের উন্মুক্ত প্লাটফরমে রাত্রিযাপন করলেন। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে জানাতে তিনি তাঁর নিজের লোকের কার্য্যই সমর্থন করলেন, কেবল সৌজন্যের খাতিরে গান্ধী যাতে নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারেন তার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। একদিন এক ঘোড়ার গাড়ীতে গান্ধী প্রিটোরিয়া যাচ্ছেন, এমন সময় এক শ্বেতাঙ্গ তাঁকে গাড়ীর বাইরে বাক্সের উপর গিয়ে বসতে

বললে ; গান্ধী বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীর মাথায় এসে কোচম্যানের পাশে বস্‌লেন। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে সেই গোরাটি তাঁকে হুকুম করলে তুমি ভিতরে যাও, আমি এখানে বস্‌বো ; তার তখন চুরুট খাওয়া এবং হাওয়া খাওয়া দরকার, কাজেই গান্ধীকে আবার গাড়ীর ভিতরে বস্‌তে হবে। গান্ধী প্রতিবাদ করলেন। তখন সেই বর্ব্বর শ্বেতাঙ্গ-তনয় তাঁকে ঘুষি মেরে গাড়ী থেকে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলে। এমনি ক'রে এখানে বহুবার শ্বেতাঙ্গদের হাতে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে, বহুবার তাঁকে তাদের পদাঘাত সইতে হয়েছে। আজ তাঁকে যে আঘাত করে সে আঘাত তাকেই গিয়ে পুনরায় আঘাত করে, কিন্তু সেদিন সহস্র অপমান ও আঘাতের মধ্য দিয়ে নিপীড়নের বেদনা তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। দেহ তাঁর আহত হয়েছিল কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে অধ্যাত্ম-শক্তি ক্রমেই দুর্নিবার হয়ে উঠছিল।

এদিকে গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ শেষ হয়ে গেল। যেদিন তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করবার কথা সেদিন তাঁর সম্মানে সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়েরা এক প্রীতিভোজের আয়োজন করে। হঠাৎ সেইদিনই খবরের কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে গবর্ণমেণ্ট এক আইন পাশ করেছেন যার দ্বারা নাতাল ব্যবস্থাপক-সভায় ভারতীয়দের সভ্য মনোনয়ন করার যে অধিকার ছিল সে অধিকার রদ করা হবে। গান্ধী দেখলেন এই আইন পাশ হয়ে গেলে ভারতীয়দের লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ চরমে পৌঁছবে। সেইদিনকার প্রীতিভোজে সমবেত ভারতীয়েরা স্থির করলেন গান্ধীর দেশে ফিরে যাওয়া হবে না, তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ ক'রে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাবেন। গান্ধীও

সেই ব্রত গ্রহণ করলেন, বিশিষ্ট ভারতীয় বণিকগণ তাঁর সহযোগিতা করতে অগ্রণী হ'লেন।

গান্ধীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতার ফলে ১৮৯৪ সালের ২২শে মে নাতাল ইণ্ডিয়ান্ কন্‌গ্রেস্ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই উপলক্ষে দলগঠন ও চাঁদাতোলার ব্যাপারে গান্ধীজির দক্ষতা দেখে সকলে বিস্মিত হয়েছিলেন। নাতাল কন্‌গ্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন গান্ধী। এদিকে কিন্তু সমস্ত আন্দোলন ও আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ ক'রে দিয়ে উপরোক্ত আইন পাশ হয়ে গেল।

আইন পাশ হ'ল বটে কিন্তু কন্‌গ্রেসের প্রচারের ফলে প্রবাসী ভারতীয়গণ তাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে লাগলো। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা কৃষিকর্ম্মের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষ থেকে শ্রমিক নিয়ে যেতো। এই সকল শ্রমিকরা চুক্তি হিসাবে কাজ করতো এবং চুক্তি শেষ হয়ে গেলে তাদের অধিকাংশই দক্ষিণ আফ্রিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতো। এই স্থায়ী বাসিন্দা ভারতীয় চাষীরা নানাবিধ শস্য উৎপাদন করতো। ভারতবর্ষের বীজ বপন ক'রে আফ্রিকার উর্ব্বর ভূপৃষ্ঠে তারা সোনা ফলিয়ে তুল্‌তে লাগলো। ক্রমে এরা ব্যবসা ক'রে রীতিমত সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলো। তাদের উন্নতিতে শ্বেতাঙ্গরা ঈর্ষায় জ্ব'লে উঠলো। তারা আইন করলে যে ভারতীয়েরা দুই বৎসরের চুক্তিতে কাজ করবে এবং চুক্তি শেষ হয়ে গেলেই তারা নতুন চুক্তি করবে, না হয় দেশে ফিরে যাবে। অর্থাৎ তারা স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন ক'রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না। এ আইন ভঙ্গ করলে তাদের মাথা পিছু ২৫ পাউণ্ড বা ৩৭৫৲ টাকা কর দিতে হবে। কংগ্রেসের প্রথম কর্ত্তব্য হ'ল এর বিরোধিতা করা। গান্ধী এক অভিনব পন্থা অবলম্বন

করলেন। এই অভিনব পন্থাই বোধ করি কামান-বন্দুকের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করার একমাত্র পন্থা।

এই অভিনব যুদ্ধনীতির নাম সত্যাগ্রহ বা অহিংস প্রতিরোধ নীতি। যে অন্যায়কে অসত্য ব'লে মনে জানবো তাকে অহিংস ভাবে প্রতিরোধ করা, অন্যায়কারীর সঙ্গে সহযোগিতা না করা এবং সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার নীরবে প্রশান্তভাবে এতটুকু বিদ্বেষ পোষণ না ক'রে সহ্য করা—এই হচ্ছে সত্যাগ্রহের মূল কথা। তাঁর সত্যাগ্রহ মন্ত্রে বিশ্বাসী কয়েকজন অন্তরঙ্গের সহকারিতায় গান্ধী ডারবান্ থেকে ১৪ মাইল দূরে ফিনিক্স নামক স্থানে এক আশ্রম স্থাপনা করেন। এই আশ্রমকে কেউ কেউ 'টলস্টয় ফার্ম্ম' ব'লে থাকেন কেননা টলস্টয়ের আদর্শ গান্ধীকে অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছিল।

গান্ধীর সত্যাগ্রহের মন্ত্রে অনেকেই উদ্বুদ্ধ হ'লেন এবং নাতাল কনগ্রেসের প্রভাব বেড়ে গিয়ে জনসাধারণের উপর ক্রমশ বিস্তারিত হ'তে লাগলো। সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করলে। ইংরাজেরা নানাবিধ নাগরিক অধিকার থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করে, ভারতীয় শ্রমিকদের জোর ক'রে চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়, আর ওদিকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জেলে আর বন্দীদের জায়গা হয় না, ছাউনী ক'রে সত্যাগ্রহী বন্দীদের রাখা হ'ল। গান্ধীর পত্নী শ্রীমতী কস্তুরী বাঈ তিন মাসের জন্য কারারুদ্ধ হ'লেন। গান্ধীর নির্য্যাতনের শেষ রইলো না। শ্বেতাঙ্গ গোরাগণ তাঁকে হিংস্র পশুর দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। বহুবার তাঁর জীবন বিপন্ন হ'ল। গোরাদের পদাঘাতে মুষ্ট্যাঘাতে এই মহাপুরুষের রক্তপাত হ'ল। হাসপাতালে তাঁর জীবনসংশয় ঘট্‌লো। অবশেষে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হ'ল।

গান্ধীর চরিত্র পদে পদে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কারামুক্ত হয়েই তিনি পরম বন্ধুভাবে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাতে লাগলেন। এবং এরই মধ্যে যখন বুয়োর যুদ্ধ বাধলো তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুগতদের নিয়ে তিনি ইংরাজ সরকারের প্রভূত উপকার করেন। গান্ধী আহত সৈনিকদের সেবাশুশ্রূষার যে ব্যবস্থা ক'রেছিলেন তা' যে কোন সভ্যজাতির অনুকরণযোগ্য।

তিনি যখন আন্দোলন স্থগিত রেখে শান্তভাবে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন তখন সহসা সংবাদ পাওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের অধিকার আরও খর্ব্ব করার উদ্দেশ্য নিয়ে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছেন। সে ১৯০১ সালের কথা। ১৮৯৯ সালের বুয়োর যুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের জন্য গান্ধীর অক্লান্ত সেবা—আর ১৯০১ সালের এই আইন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সহরে গ্রামে, পথে প্রান্তরে, প্রাসাদে, কুটীরে চাঞ্চল্য দেখা দিল। বহ্নিতেজে সত্যাগ্রহ আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হ'তে লাগলো। গান্ধী প্রকাশ্য আন্দোলন শুরু করলেন। এক বিরাট সত্যাগ্রহী বাহিনী নিয়ে ট্র্যান্সভালের দিকে যাত্রা করলেন সেখানে এর প্রতিবাদ ঘোষণা করতে। সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। একটি যুবকের পিছনে সহস্র সহস্র যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধার দল অভিযান ক'রে চলেছে। সকলের মৃত্যুপণ। হয় জোহেনস্‌বার্গ, না হয় জেল। গবর্ণমেণ্ট ট্র্যান্সভাল-প্রবেশ নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন। কিন্তু নিষেধই শক্তিদান করলে—বাহিনী যত অগ্রসর ততই অনুসরণকারীর দল বাড়তে থাকে, সমগ্র দেশ যেন পথে বেরিয়েছে। পথে কত শিশুর শেষ আর্ত্তনাদ উঠলো। ভীড়ের চাপে মায়ের বুকে সন্তান শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেল, বৃদ্ধার অঙ্গহানি হ'ল। তবু কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই। সরকার

বন্দুকের সাহায্যে সেই বিপুল বাহিনী ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলেন। গান্ধীকে জেলে আটক করা হ'ল। কিন্তু সেদিনের সেই মৃত্যুপথযাত্রীদের অশ্রুতপূর্ব্ব কাহিনী সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের সকলুষ কাহিনী সভ্যজগৎকে লজ্জিত করলে। গান্ধীকে দু'মাস পরে কারামুক্ত করা হ'ল। নাতাল কন্‌গ্রেসের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আপোষ-মীমাংসা হ'ল। মানবতার অবমাননার অবসান ঘটলো। গান্ধীর সত্যাগ্রহ-মন্ত্র জয়লাভ করলে।

১৯০৬ সালে যখন জুলু বিদ্রোহ হয় তখন গান্ধী স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন ক'রে বৃটিশ সরকারকে নানা দিক দিয়ে সাহায্য করেন। তারপর ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধের সময় বিপন্ন ইংরাজ জাতিকে সাহায্য দানে অগ্রসর হন। পর বৎসর গান্ধী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কর্ম্মজীবনের মধ্যে তিনি ভারতকে বিস্মৃত হন্‌নি কিন্তু ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপনের একান্ত প্রয়োজন ছিল। ১৯১৫ সালে গান্ধী আহ্‌মেদাবাদের নিকটবর্ত্তী সবরমতীতে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমটিই সত্যাগ্রহ-প্রচারের কেন্দ্র। গান্ধীর সহকর্ম্মী আশ্রম-বাসিগণ অহিংসা ও সত্যাগ্রহের ব্রত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কাছে হিংসা পাপ, অনিষ্টকারীরও অহিত-কামনা গুরুতর অপরাধ। এই আশ্রমের সঙ্গে গান্ধী হরিজন অর্থাৎ হিন্দুজাতির অন্তর্গত অস্পৃশ্য শ্রেণীর জন্য এক 'হরিজনপল্লী'র ভিত্তিস্থাপনা করেন। এই পল্লীবাসী অস্পৃশ্য অনুন্নত ভারতবাসিগণকে গান্ধীর সত্যাগ্রহ মন্ত্রে প্রণোদিত ক'রে অপরিসীম প্রেম ও মৈত্রীর তত্ত্ব শেখানো হয়। এই পল্লীর প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ ক'রে তাপসজীবন যাপন করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অনুরূপ পল্লী গঠিত হয়েছে। এই সময়

গান্ধী নানা জেলায় দরিদ্র চাষী ও মজুরদের বহুবিধ উন্নতি বিধান করেন। ভারতবর্ষের চির-অবহেলিত আর্ত্ত জনসাধারণ গান্ধীকে তাদের পরম আত্মীয় ব'লে গ্রহণ করলে। ১৯১৭ সালে গান্ধী 'মহাত্মা গান্ধী' নামে অভিহিত হ'লেন।

১৯১৭ সালে মহাযুদ্ধে পর্য্যদস্ত বৃটেনকে সাহায্য করবার জন্য আবেদন জানিয়ে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ভারতবাসীদের আহ্বান করেন। এই আহ্বানে সর্ব্বাগ্রে গান্ধী ভারতীয় সৈন্যদল গঠন করেন। গান্ধীর চেষ্টায় যে বিপুল সেনাদল মহাযুদ্ধে বৃটেনকে রক্ষা করতে জীবনদান করেছিল তাদের বীরত্বগাথা জগদ্‌বাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছে।

ভারতবাসীর এই অকৃপণ সহযোগিতার বিনিময়ে বৃটেন যে সামান্য শাসন-সংক্রান্ত সুবিধা দিতে স্বীকৃত হ'ল তাতে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নেতৃবর্গ সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। তাঁরা ঘোষণা করলেন 'স্বায়ত্ত শাসন' তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। আন্দোলন শুরু হ'ল দ্বিগুণ-তেজে। সরকার আন্দোলনকে নিষ্পেষিত করতে বদ্ধপরিকর হ'লেন। রাওলাট বিল পাশ ক'রে ভারত সরকার পুলিশের হস্তে বিশেষ ক্ষমতা দান করলেন যাতে পুলিশের স্বেচ্ছাচারে ভীত জনতা আন্দোলন থেকে বিরত থাকে। সরকারের এই আচরণে গান্ধী অন্তরে তীব্র আঘাত পেলেন। শত অনাচারেও বৃটিশ সরকারকে তিনি বন্ধু ব'লেই জানতেন, তাঁদের সহযোগিতাই ক'রে এসেছেন। কিন্তু আজ যখন দেখলেন যে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের নীতি ভারতের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ নয় তখন তিনি বিরোধিতা করতে অগ্রসর হ'লেন।

ব্যাপকভাবে স্বরাজ্য-আন্দোলন শুরু হ'ল। হিন্দু-মুসলমান মিলিত হয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান পরিচালনা

করতে লাগলো। গান্ধী হ'লেন নেতা। তিনি হরতাল ঘোষণা করলেন। ১৯১৯ সালের ১৪ই এপ্রিল অমৃতসরে এক প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানে সম্মিলিত নবনারীর উপর ইংরেজ পুলিশ কর্ম্মচারী গুলি চালনা করলে। সেই অবরুদ্ধ জনতা অসহায়ভাবে ঈশ্বরের কাছে অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনা ক'রে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলে। সেইদিনকার তাদের পুণ্য রক্তপাতে ভারতবাসী উপলব্ধি করলে তারা কত অসহায়। কিন্তু সেই রক্তশিখায় লক্ষ লক্ষ প্রাণবহ্নি নিমেষে জ্ব'লে উঠলো। গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করলেন, তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল সম্পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন। সরকারী প্রতিষ্ঠান বর্জ্জন করা হ'ল। সরকারী স্কুল-কলেজ থেকে ছেলেরা বেরিয়ে এলো, সরকারী দপ্তরখানা থেকে বেরিয়ে এলো কেরানীর দল। বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করা হ'ল গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে। ব্রিটিশ সরকারকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অস্বীকার করাই হ'ল সেদিনকার ভারতবর্ষের একমাত্র কর্ত্তব্য।

কিন্তু এই সকলের মূলে ছিল অহিংসার মন্ত্র। গান্ধী ভেবেছিলেন ভাবতবাসীরা অহিংসার মন্ত্র পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে। অকস্মাৎ একদা তাঁর সে বিশ্বাস চূর্ণ হ'ল। ১৯২১ সালের চৌরিচৌরায় সন্ত্রস্ত পথভ্রান্ত ক্ষিপ্ত জনতা সরকারী পুলিশ কর্ম্মচারীদের নৃশংসভাবে হত্যা করলে। এই সংবাদে গান্ধী নিদারুণ আঘাত পেলেন। একি, এ যে হিংসা! সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি অহিংসার প্রচার করেছেন, তার কি শেষে এই ফল! সত্যাগ্রহীর শত্রু তো কেউ নেই, অহিংসার কাছে বধ্য তো কেউ নয়—তবে এ তারা কী করলে! মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন স্থগিত রাখলেন। এই হত্যার জন্য তিনি নিজেকে দায়ী করলেন সকলের বেশি। তাঁর মনে হ'ল তিনিই পাপ করেছেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি অনশন-ব্রত গ্রহণ করলেন। এই

কয়টি দিন ভারতবর্ষের কুটীরে কুটীরে আর্ত্ত নরনারী গান্ধীর জীবন ভিক্ষা ক'রে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল।

১৯২২ সালে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। দেশের সর্ব্বপ্রকার অসন্তোষ ও আন্দোলনের দায়িত্ব নিজ শিরে বহন ক'রে গান্ধী কারাবরণ করলেন। তিনি এর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

১৯২৪ সালে কারামুক্ত হয়ে গান্ধী দেখলেন যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব দেশে শিথিল হয়ে এসেছে। স্বরাজ্যদলের কিছু প্রভাব আছে বটে কিন্তু তাঁদের দ্বারা কোন সুচিন্তিত পথ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। দেশের চারিদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আত্মকলহে হীনবল। গোপনচারী বিপ্লবীর দল নানা স্থানে রাজপুরুষদের হত্যা করছে। দিল্লী, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, কোহাট প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়ে গেল। এই আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধির বিনাশ করতে, সমগ্রজাতিকে সচেতন ক'রে তুলতে গান্ধী পুনরায় অনশনব্রত গ্রহণ করলেন। এতবড একটা জীবনের বিনাশ-সম্ভাবনায় ভীত হয়ে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়ে এক যুক্ত কর্ম্মপদ্ধতির খসড়া তৈরী করলেন। একুশ দিন পরে কমলালেবুর নির্য্যাস পান ক'রে গান্ধী প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করলেন। ১৯২৪ সালে বেলগমে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হ'ল। এই অধিবেশনে গান্ধীর সভাপতিত্বে স্বরাজ্যদল কন্‌গ্রেসের সঙ্গে মিলিত হ'ল। কন্‌গ্রেস্ ভারতবর্ষের একমাত্র জাতীয় মহাসভা ব'লে স্বীকৃত হ'ল।

কন্‌গ্রেস এক শাসনপদ্ধতির খসড়া ক'রে সরকারের কাছে স্বায়ত্ত শাসন দাবী করলেন। সরকার সে দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। ধর-পাকড, খানাতল্লাসী প্রভৃতির দ্বারা সরকারী দমননীতির যে পরিচয় পাওয়া যেতে লাগলো তাতে নেতৃবৃন্দ সংগ্রাম অপরিহার্য্য ব'লে মনে

করলেন। কয়েক বৎসর কাট্‌লো জল্পনা-কল্পনা ক'রে। তারপর সহসা গান্ধী এক অনভিভবনীয় সংগ্রাম-পদ্ধতি নিয়ে আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন।

সমুদ্রতীরে যে লবণ প্রস্তুত হয় সরকার আইন ক'রে সেই লবণ তৈরী বিনা করদানে নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন। এই কারণে দীনতম ভারতবাসীকেও প্রতিটি গ্রাস অন্নের সঙ্গে গবর্ণমেন্টকে কর দিতে হয়। গান্ধী স্থির করলেন এই আইন ভঙ্গ ক'রে তিনি সরকারের শাসনের বিরোধিতা করবেন। এই সামান্য লবণ-করের বিরুদ্ধে অভিযান করার পরিকল্পনা শুনে অনেকেই তাঁকে পাগল ভাবলে। লোকে ভেবেই পেলে না এই ব্যাপারের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কী যোগ থাকতে পারে! গান্ধীজি কিছুমাত্র বিচলিত হ'লেন না। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ্চ বুধবার রাত্র প্রভাত হ'লো। আশ্রম বাসিনী আর্য্যকন্যাগণ গান্ধীর ললাটে রক্তকুঙ্কুমের তিলক এঁকে দিলেন। শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হ'ল আশ্রম-কানন। ঠিক ৬-৩০ মিনিটের সময়ে প্রার্থনা সমাপন ক'রে গান্ধী সবরমতী আশ্রম থেকে সমুদ্রতীরে দাণ্ডীর অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে তাঁর ৭৯ জনের এক নীরব, দৃঢ়চেতা সেনাবাহিনী! গান্ধীজির পণ—"হয় দাণ্ডীর সমুদ্র-উপকূলে লবণ তৈরী করবো, না হয় সেই লবণসমুদ্রে আমার মৃতদেহ ভেসে যাবে।"

পৃথিবীর ইতিহাসে এ আন্দোলনের তুলনা পাওয়া যায় না। সহায়হীন, সম্বলহীন নিরস্ত্র চীরবাসপরিহিত সন্ন্যাসীর দল অভিযান শুরু করলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজশক্তির বিরুদ্ধে! দেখতে দেখতে এই আইন-অমান্য-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র দেশের অন্তরে অন্তরে। নির্য্যাতনে, কারাবাসে সে কী বিজয়ের আনন্দ! অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত

ভারতবাসী যত নির্য্যাতিত হয় ততই যেন তার শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সরকারের দমননীতি আন্দোলনকে বিস্তৃত ক'রে দিলে। গান্ধী বন্দী হ'লেন, বন্দী হ'ল লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট একটা মীমাংসার জন্য কন্‌গ্রেসকে আহ্বান না ক'রে গোল টেবিল বৈঠক ডাক্‌লেন। কিন্তু দেখা গেল কন্‌গ্রেসকে বাদ দিয়ে বৈঠকের কোন সার্থকতা নেই। অবশেষে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন গান্ধীকে আহ্বান করলেন। তাঁদের মধ্যে চুক্তি হ'ল গোল টেবিল বৈঠক শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গান্ধী আন্দোলন স্থগিত রাখবেন। কন্‌গ্রেস গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করলেন। গান্ধী খদ্দরপরিহিত হয়ে বিলাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। ইয়োরোপের বহু মনীষী তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। কিন্তু গোল টেবিল অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়ে গেল। বৃটিশ মন্ত্রীদের মনোভাবে গান্ধী ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে এলেন। ভারতবর্ষে অবতরণ করা মাত্র তাঁকে গ্রেফ্‌তার করা হ'ল।

গান্ধীর আত্মিক বল পৃথিবীর যে কোন শক্তির চেয়ে পরাক্রম-শালী। তিনি তাঁর আত্মার বাণী শুনে কাজ করেন। তাঁর অন্তরে একটিমাত্র জিনিস তাঁকে চালিত করে—সে ভালোবাসা, মৈত্রী। তিনি তাঁর দেশকে ভালোবেসেছেন—দীন অস্পৃশ্য তাঁর আপনার জন, কুবেরের মত বিত্তশালীকেও তিনি সস্নেহে ভর্ৎসনা করেন। তাঁর কাছে পর কেউ নেই, নীচ কেউ নেই। গোল টেবিলে যখন অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্ব্বাচনের বন্দোবস্ত ক'রে হিন্দুজাতিকে দ্বিখণ্ডিত করবার চেষ্টা করা হ'ল তখন তিনি জীবন দিয়ে তার প্রতিকার করতে উদ্যত হ'লেন। তিনি প্রায়োপবেশন-ব্রত গ্রহণ করেন এবং ঐ ব্যবস্থা রদ্

না হওয়া পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করেননি। তিনি যাদের ভালোবাসেন তাদের জন্য তিনি সব করতে পারেন। ১৯৩৯ সালে রাজকোটের কতকগুলি প্রজার ন্যায্য অধিকার দাবী ক'রে তিনি উপবাস করেছিলেন। সে অধিকার তারা না পেলে তিনি জীবনদান করতেন।

তাঁর শত্রু কেউ নেই, এবং তাঁর মন্ত্রে যাঁরা দীক্ষিত তাঁরাও কারুকে শত্রুজ্ঞান করেন না। যে তাঁকে মারে তিনি তার জন্য দুঃখিত হন এই ভেবে যে, সে আঘাত ক'রে নিজেকেই নিঃশেষ করছে। তাঁর ভয় হয় বুঝি সে আঘাত আঘাতকারীকেই ফিরে আঘাত করে। এই যে সারাজীবন ধ'রে এত মার খেয়েছেন, কখনো একটি কথা বলেননি, কখনো রাগ করেননি, কোন বিদ্বেষ পোষণ করেননি। বর্ত্তমান মহাসমর যখন আরম্ভ হয় তখন কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা চেয়েছিলেন এই সুযোগে ব্যাপক আন্দোলন ক'রে বৃটেনকে বিব্রত ক'রে স্বাধীনতা আদায় ক'রে নিতে। কিন্তু তিনি বল্লেন—না। তার জন্য দেশবাসী তাঁকে কটূক্তি করেছে, তাঁর প্রতি অনেকে বিশ্বাস হারিয়েছে, কিন্তু তিনি অটল। যে রাজশক্তির হাতে তাঁর লাঞ্ছনার অন্ত নেই, সমগ্র-জাতি যে সাম্রাজ্য-নীতির কবলে অহরহ নিপীড়িত হচ্ছে সেই রাজ-শক্তিরও দুর্গতির দিনে তাকে আঘাত করতে তিনি নারাজ। কেননা, এখন যে বৃটিশজাতি বিপন্ন, বৃটেনের জনগণ তো কোন দোষ করেনি, তাদের পীড়ন করতে তাঁর প্রাণে বাজে। এইটিই হ'ল অহিংসার মূল কথা—নীতির বিরোধিতা করার অর্থ নরদেবতার বিরুদ্ধে হিংসা পোষণ করা নয়।

আঘাতের বিনিময়ে আঘাত ক'রে আজ যেন সকলে মিলে মরবার পণ করেছে, শক্তিহীন হবার পণ করেছে। এতে তো জগতের কল্যাণ নেই। গান্ধী যে-ভবিষ্যৎসমাজের কল্পনা করেন সে সমাজে

সকল বিরোধের মীমাংসা হবে অহিংসার মন্ত্রে, সেখানে আইন ক'রে ধন-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে না। ধনী স্বেচ্ছায় সমাজের কল্যাণে তার ধন বিলিয়ে দেবে, দরিদ্রকে আশ্রয় দেবে, আহার্য্য দেবে। মানুষের জান্তব প্রকৃতি প্রকৃত মানবপ্রকৃতিতে পরিণত হবে। ভারতবাসী আমাদের ঘরে ঘরে আমরা গান্ধীর বাণীকে আহ্বান করি।

"ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারই হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারই হউক জয়॥"

